সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ্।

PRINTED BY U. RAY & SONS.

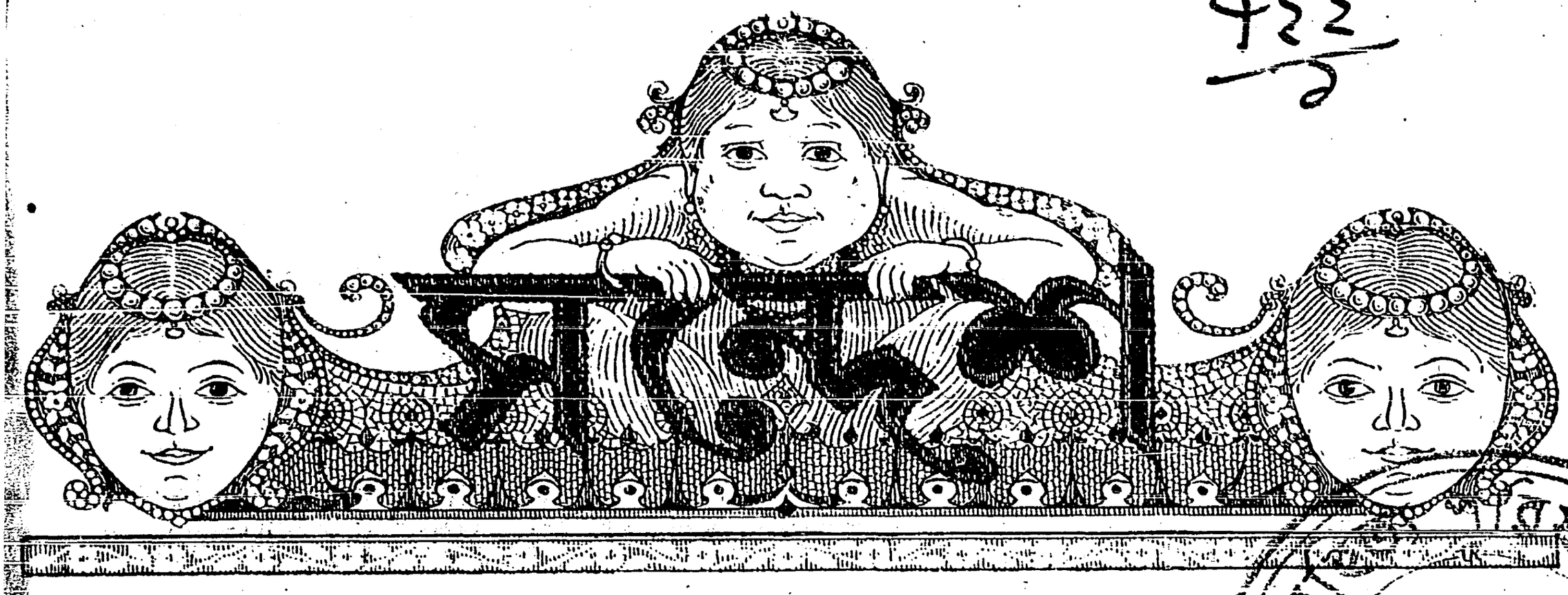

৭৫২
১

প্রথম বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কলিকাতা

স্থখেতে সংসারে রাখহ রাজারে,
হে পরমেশ ;
কল্যাণে, গৌরবে,
বিজয়ে, বৈভবে,
যশো মান ভবে
দিয়ে অশেষ।

করুণা নয়নে চাহ তাঁর পানে
হে দয়াময়,
চিরায়ু করিয়ে,
বিপদ হরিয়ে,
ব্যাধি বৈরী ভয়ে
দেহ আশ্রয়।

সম্পদে বিপদে রাখিয়ে শ্রীপদে
দেহ অভয়,
প্রীতি প্রজাকুলে,
কীর্ত্তি ধরাতলে,
শক্তি স্থলে জলে,
কর অক্ষয়।

(God save the King এর স্থর।)

আমাদের সম্রাট্।

১৮৬৫ সালের ৩রা জুন আমাদের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জন্ম হয়। এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ২০শে তারিখ তাঁহার ৪৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের প্রিয় সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হইয়া আরো অনেক বৎসর সুখে রাজ্য ভোগ করুন।

সম্রাটের সম্পূর্ণ নাম 'জর্জ্জ্ ফ্রেডারিক্ আর্ণেষ্ট্ আল্বার্ট্'। চারিজনের নাম মিলাইয়া এই নামটির সৃষ্টি হইয়াছে। সেণ্ট্ জর্জ্জ্ মহাপুরুষ ছিলেন, জর্জ্জ্ নামটি তাঁহার নাম হইতে লওয়া হইয়াছে। ফ্রেডারিক আর্ণেষ্ট্ আর আলবার্ট্, ইঁহারা সম্রাটের পূর্ব্বপুরুষ। আলবার্ট্ তাঁহার পিতামহ ছিলেন, ফ্রেডারিক আর আর্ণেষ্ট ইঁহারও পূর্ব্বেকার লোক।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের একটি বড় ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল আলবার্ট ভিক্টর খ্রীষ্টিয়ান্ এড্ওয়ার্ড। লোকে ইঁহাকে প্রিন্স্ ভিক্টর বলিয়া ডাকিত। বাঁচিয়া থাকিলে ইহাঁরই সম্রাট্ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ১৮৯২ সালের ৯ই জানুয়ারি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। দুটি ভাইয়ের মধ্যে বড়ই ভালবাসা ছিল। প্রিন্স্ জর্জ্জ্ (আমাদের সম্রাট্) বয়সে ছোট হইলেও, কাজে ছিলেন যেন বড় ভাই। দু ভাইয়ে মিলিয়া দুরন্তপনা যে নিতান্ত কম করিতেন তাহা নহে; আর তাহার বুদ্ধিটা প্রায়ই ছোট ভাইটির মাথায় আগে যোগাইত। ইঁহাদিগকে সামলাইয়া রাখা গুরুজনদের পক্ষে বড় সহজ কাজ ছিল না।

এই দুরন্তপনার ভাগ অনেক সময় ইঁহাদের ঠাকুরমা মহারাণী ভিক্টোরিয়াকেও পাইতে হইত। একদিন তিনি তাঁহাদিগকে একটু সাজা দিবার জন্য বলিলেন, "যাও, টেবিলের নীচে গিয়া বসিয়া থাক; লক্ষ্মী ছেলে না হইলে বাহিরে আসিতে পাইবে না।" ছেলে দুটি আর কি করে? ঠাকুরমার হুকুম হইয়াছে, কাজেই তাহারা টেবিলের নীচে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খানিক বাদে তাহারা বলিল, "ঠাকুমা! এইবারে আমরা লক্ষ্মী হয়েছি!" ঠাকুরমা বলিলেন, "আচ্ছা, তবে এস।" অমনি দুটি খোকা নাচিতে নাচিতে টেবিলের নীচ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাপড় চোপড় যাহা কিছু ছিঁড়ে সব তাহারা টেবিলের নীচেই লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে,—ঘুন্সীটি পর্য্যন্ত তাহাদের পরণে নাই! ঠাকুর্মা আর রাগ করিবেন কি, তিনি হাসিয়াই অস্থির।

খুব অল্প বয়সেই দুভাইকে যুদ্ধের জাহাজে গিয়া মাঝি মাল্লার কাজ শিখিতে হইয়

ছিল। তখন অন্য ছেলেদের সঙ্গে তাঁহাকে ঠিক সমানভাবে থাকিতে হইত। রাজার বিশেষ আদেশ ছিল যে, রাজপুত্র বলিয়া ইঁহাদের বেলা কোন রকম অনুগ্রহ দেখান না হয়।

সেই সময়ে একদিন প্রিন্স্ জর্জ্জ্ তামাসা দেখিবার জন্য জাহাজের একজন কর্ম্মচারীর বিছানায় কাঁটা গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন। কাঁটার খোঁচা খাইয়া কর্ম্মচারী মহাশয়ের অবশ্য খুবই রাগ হইল, আর তখনই ছেলেদের যার পর নাই তাড়া পড়িল, এ কাজ কে করিয়াছে? খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহারা অপর একটি ছেলেকে দোষী স্থির করিলেন। প্রিন্স্ জর্জ্জ্ যখন দেখিলেন যে তাঁহার দোষে অপরের সাজা হইতে চলিয়াছে, তখন তিনি সেই কর্ম্মচারীকে বলিলেন যে, "মহাশয়, উহার কোন দোষ নাই, এ আমারই কাজ।" তাহাতে এক সপ্তাহের জন্য তাঁহার খেলা বন্ধ হইয়া দ্বিগুণ পড়ার হুকুম হইল।

জাহাজী সৈন্যের কাজ তাঁহারা খুব ভাল করিয়াই শিখিয়াছিলেন। মাঝি মাল্লা হইতে আরম্ভ করিয়া সেনাপতির কাজ পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় নাই। আর সকলে যেমন ক্লেশ ও পরিশ্রম করিত, তাঁহারাও তাহার সমস্তই করিতেন, তাহার উপরে আবার তাঁহাদের অনেক পড়া শুনা করিতে হইত। খাওয়া দাওয়া সকলের সঙ্গেই সমান মোটা হিসাবে চলিত। ওট্‌মীলের মণ্ড খাইতে প্রিন্স্ জর্জ্জ মোটেই ভালবাসিতেন না। কিন্তু জাহাজে আসিয়া প্রথম দিনেই দেখেন, সেই জিনিষ আসিয়া টেবিলে উপস্থিত হইয়াছে, আর অপর ছেলেরা উৎসাহের সহিত তাহা খাইতেছে। তখন "ভাগ্যিস্ আমি এ জিনিস খেতে পারি!" বলিয়া তিনিও তাহা খাইতে লাগিলেন।

যে জাহাজে রাজপুত্রেরা আসিয়াছিলেন, তাহার নাম ব্রিটানিয়া। সে জাহাজে আর প্রিন্স্ জর্জ্জের মতন ছোট্ট ছেলে কখনও কাজ শিখিতে আসে নাই। কিন্তু ছোট্ট বলিয়া কাজে তিনি কাহারও চেয়ে কম ছিলেন না। দাঁড় টানা পাল খাটান প্রভৃতি সকল কাজেই তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি হইয়াছিল। বন্দুকে তাঁহার মতন ঠিক হাত ইংলণ্ডের অতি অল্প লোকেরই আছে।

ব্রিটানিয়া জাহাজে দুই বৎসর কাজ শিখার পর ১৮৭৯ সালে রাজপুত্র ভিক্টর আর জর্জ্জ্ ব্যাক্‌ক্যাণ্ট্ নামক জাহাজে চড়িয়া দুই বৎসর পৃথিবীর নানা স্থান দেখিয়া বেড়ান। সে সময়ে অপর সকলের ন্যায় তাঁহারাও জাহাজের কাজ করিতেন। জাহাজ চালান, কামান ছোঁড়া, প্রভৃতি সকল কাজ করিয়া আবার তাঁহাদিগকে গনিত আর ফরাসী ভাষা শিখিতে হইত। ইহার উপর আবার প্রতিদিন দিনের কাজের ডাইরী লেখার নিয়ম ছিল। যতই নিদ্রা আসুক, ডাইরীটি না লিখিয়া ঘুমাইতে পাইতেন না।

সেই জাহাজে থাকিবার সময় একবার ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া ভয়ানক ঝড় হয়। সে ঝড়ে কাহারও দাঁড়াইয়া থাকিবার সাধ্য ছিল না। জাহাজের জিনিসপত্র সব বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল। খাইবার সময় এক হাতে প্লেটখানি ধরিয়া আর এক হাতে খাইতে হইত। জাহাজের পাল ছিঁড়িয়া গেল, হাল ভাঙ্গিয়া গেল। সকলের মনে হইল যে এবারে আর রক্ষা নাই। এমন ভয়ঙ্কর সময়েও রাজপুত্রেরা হামাগুড়ি দিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, সকলের সঙ্গে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কতবার সেই তাড়া হুড়োর মধ্যে অন্য মাল্লারা ঝড়ের ধাক্কায় তাঁহাদের উপরে পড়িয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহারা নিজের কাজ করিতে ছাড়েন নাই।

জাহাজে থাকিবার সময় এমনি করিয়া তাঁহারা সামান্য লোকের মতন খাটিতেন একবার এই বিষয় লইয়া একটা মজার ঘটনা হইয়াছিল। তখন রাজপুত্র জর্জ্জ ড্রেড্‌নট্ নামক জাহাজে লেফ্‌টেনেণ্টের কাজ করিতেন। জাহাজটা সেই সময় পোর্ট্‌সেইডে গিয়াছিল। ইজিপ্তের খিদীব টিউফিক্ পাশা যখন খবর পাইলেন যে রাজপুত্র জর্জ্জ্ সেই জাহাজে আছেন, তখন তিনি খুব জাঁকজমকের সহিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ঠিক সেই সময়ে জাহাজে কয়লা বোঝাই হইতেছিল, আর প্রিন্স জর্জ্জের উপরে সেই কাজ দেখার ভার ছিল। খিদীবও তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন আর তাঁহার কাজও শেষ হইয়াছে, আর তিনি কয়লার গুঁড়ায় কালো হইয়া জাহাজের নীচে হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সেই চেহারা দেখিয়া খিদীবের কিছুতেই বিশ্বাস হইলনা যে ইনিই ইংলণ্ডের রাজপুত্র। তিনি ভাবিলেন নিশ্চয়ই তাঁহাকে ঠাট্টা করা হইয়াছে। কাজেই তিনি বেজায় চটিয়া গিয়া তখনই সেই জাহাজ হইতে চলিয়া আসিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাজপুত্রেরা ক্রমাগত দুই বৎসর ধরিয়া ব্যাক্‌ক্যাণ্ট্ নাম জাহাজে চড়িয়া পৃথিবীর নানা স্থান দেখিয়া বেড়ান।

তাঁহাদের দুজনকে দেখিয়া নানা স্থানের লোকেরা নানা রকমে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিত। কেহ আসিয়া তাঁহাদের গাড়ীর চাকা জড়াইয়া ধরিয়া চুমো খাইত; অনেকে প্রণাম করিত। অনেকে ফুল ফল দিত।

এক জায়গায় একটি ভারতবর্ষীয় মজুর * তাহার খোকাটিকে কোলে করিয়া রাজপুত্র

---

* ভারতবর্ষের মজুরেরা অনেক দূরদেশে অবধি কাজ করিতে যায়। এই ঘটনাটি ট্রিনিডাডে ঘটিয়াছিল।

দিগকে দেখিবার জন্য ঘণ্টা দুই এক জায়গায় দাঁড়াইয়া ছিল। রাজপুত্র জর্জ্জ্ তাহাকে দেখিতে পাইয়া, ছুটিয়া গিয়া খোকাটির (না কি সে খুকী ছিল, তাহা জানিনা) হাতে একটি মিঠাই দিলেন। সেই খোকার বাবা ইহাতে এতই খুসী হইল যে, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে কতকগুলি পট্‌কা লইয়া আসিল, আর সেগুলি ফুটাইয়া তাহার আনন্দ প্রকাশ করিল।

আর এক জায়গায় একটি মজুরণী—সে ও ভারতবর্ষের লোক—বেচারী অনেক দূর অবধি তাঁহার গাড়ীর পিছু পিছু ছুটিয়াছিল। যখন আর সে ছুটিয়া কুলাইতে পারিল না, তখন সে তাহার হাতের রূপার বালা খুলিয়া গাড়ীতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

একটি বুড়া নিগ্রো আর কিছু না পাইয়া নিজের পঞ্চাশ বৎসরের পুরানো লাঠিটিই তাঁহাদিগকে দিয়া দিল।

১৮৯১ সালে প্রিন্স্ জর্জ্জের টাইফয়ড্ জ্বর হয়। অনেক কষ্টে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। ইহার পরের বৎসর জানুয়ারি মাসে প্রিন্স্ ভিক্টরের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইল। কত চিকিৎসা কত যত্ন হইল, কিছুতেই তাঁহাকে বাঁচান গেল না।

প্রিন্স্ ভিক্টরের মৃত্যুতে প্রিন্স্ জর্জ্জই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন, আর তখন হইতেই তাঁহাকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। কাজেই জাহাজী সৈন্যের ব্যবসায় আর তাঁহার করা হইল না। সে যাহা হউক তিনি যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তেমন সুন্দর শিক্ষা খুব কম রাজার ছেলেরাই পায়। আর, বোধ হয়, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি কোন রাজার ছেলে এত দেশ দেখিয়া এত লোকের রীতি নীতি লিখিতে পারে নাই।

একটা কঠিন কাজ উপস্থিত হইলে আমাদের সম্রাট যেমন চট্ করিয়া তাহার উপায় স্থির করিতে পারেন, তেমন অতি অল্প লোককেই করিতে দেখা যায়।

১৮৯৪ সালের ৫ই জুলাই রাজকুমারী মেরীর সহিত রাজপুত্র জর্জ্জের বিবাহ হয়। ইঁহাদের পাঁচটি পুত্র আর একটি কন্যা। বড় ছেলেটির নাম প্রিন্স্ এড্‌ওয়ার্ড্ আলবার্ট খ্রিষ্টিয়ান্ জর্জ্জ এণ্ড্রু প্যাট্রিক্ ডেভিড্। ১৮৯৪ সালের ২৩এ জুন ইঁহার জন্ম হয়। ইনিই এখন প্রিন্স্ অব ওয়েল্‌স্। ইঁহার পরে রাজপুত্র এলবার্ট্ ফ্রেডারিক আর্থার জর্জ্জ্, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া আলেক্‌জান্দ্রা এলিস্ মেরী আর তিনটি ছোট ছোট ভাই।

১৯০১ সালের ২২এ জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হওয়ায় সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড্ রাজা হইলেন। এবং তখন রাজপুত্র জর্জ্জ্ প্রিন্স অব ওয়েলস্ হন। তারপর ১৯০৫ সালের নবেম্বর মাসে তিনি সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আসেন।

১৯১০ সালের ৭ই মে সম্রাট এড্‌ওয়ার্ড ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে দেহ ত্যাগ করেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ রাজা হইয়া পুনরায় সাম্রাজ্ঞীকে সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আসেন, এবং দিল্লীতে আবার তাঁহাদের অভিষেক হয়। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের আর কোন রাজা ভারতবর্ষে আসেন নাই, তাই সম্রাট্‌কে দেখিয়া এ দেশের লোকের বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। এই সময়ে ভারতবাসীরা তাঁহাদের নিকট যে সদয় সরল ব্যবহার পাইয়াছিল, তাহা তাহারা কখনও ভুলিতে পারিবে না।

আমাদের সম্রাটের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে জর্জ্জ নামক আরো চারিজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাই ইঁহার নাম "পঞ্চম" জর্জ্জ।

—— * ——

প্রাচীন কালের কথা।

আফ্রিকা আর আমেরিকার মাঝখানে আটলাণ্টিক মহাসাগর। প্রাচীনকালে অনেক দেশের লোকে বিশ্বাস করিত যে এই আটলাণ্টিক মহাসাগরের জায়গায় আরো ঢের প্রাচীনকালে, অর্থাৎ প্রায় এগার বারো হাজার বৎসর পূর্ব্বে 'আটলাণ্টিস্' বলিয়া একটা প্রকাণ্ড দেশ ছিল। উহাই নাকি ছিল পৃথিবীর সকলের চেয়ে পুরাতন সভ্যদেশ। প্রাচীন মিসর দেশের লোকেরা বলিত যে বহুকাল পূর্ব্বে সেই আটলাণ্টিস্ নামক দেশ হইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মিসরে আসিয়াছিল, আর সেই অতি প্রাচীন দেশের সভ্যতা তাহারা মিসরে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল।

সে দেশের লোকেরা নাকি ভারি বিদ্বান আর বুদ্ধিমান ছিল। ইউরোপের লোকেরা তখন কিছুই জানিত না, গ্রীস্ রোম এ সকল দেশ তখনও হয়ই নাই। একবার আটলাণ্টিসের লোকেরা অনেক হাজার সৈন্য লইয়া ইউরোপ জয় করিতে বাহির হইল, আর সেই সময়ে ভয়ানক ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া তাহাদের দেশ সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। তাহাতে সমুদ্রের জলে এমন বিশাল ঢেউ উঠিয়াছিল যে সেই ঢেউ আসিয়া সেই সকল সৈন্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহাদের আর ইউরোপ জয় করা হইল না।

অবশ্য, আজকালকার লোকে এসব কথায় বিশ্বাস করে না। আমরা জানিতাম যে ইহার আগাগোড়াই গল্প। ইহার মধ্যে আবার দু একজন পণ্ডিত বলিতেছেন যে, বাস্তবিকই আটলাণ্টিস বলিয়া একটা দেশ এক সময়ে ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ট্রয় নগরের জমি খুঁড়িয়া নাকি একটা ধাতুর পাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভিতরে কতকগুলি জিনিসে 'আটলাণ্টিসের রাজা ক্রণসের' নাম লেখা। সে জিনিষগুলি তাহার নিকট হইতে ট্রয় নগরে আসিয়াছিল। এইরূপ আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে আটলাণ্টিসের কথা সত্য।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলার মাটী পরীক্ষা করিলেও নাকি এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে সেখানে কোন কালে একটা বড় রকমের ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির কাণ্ড হইয়াছিল।

এ সকল কথার বিচার পণ্ডিতেরা করিতেছেন। আটলাণ্টিস্ ছিল বলিয়া একটা দেশ কি না তাহা তাঁহারাই স্থির করিবেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, নানাকারণে পৃথিবীতে ক্রমাগতই অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। ১৮৯৭ সালে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে আসামের কোন কোন পাহাড় উঁচু নীচু হইয়া গিয়াছে। ১৮১৯ সালে কচ্ছদেশে ভূমিকম্প হইয়া সিন্দ্রী নামক একটা গ্রাম জলে ডুবিয়া যায়, আর উহার কাছে প্রায় ৫০ মাইল লম্বা একটা পাহাড় গজাইয়া উঠে।

১৭৬২ সালে চট্টগ্রামে ভূমিকম্প হইয়া অনেকখানি জায়গা ধসিয়া গিয়াছিল, দুইটা দ্বীপ উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল, অনেকগুলি পাহাড় ফাটিয়া গিয়াছিল, আর একটা পাহাড় একেবারে বসিয়া গিয়াছিল।

আমাদের এই যে ভারতবর্ষ, ইহার চেহারা আজকাল ম্যাপে যেমন দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালে সে রকম ছিল না। তখন হিমালয় পর্ব্বতটাও এত প্রকাণ্ড ছিল না। কেহ কেহ বলেন যে এক সময়ে হিমালয় ছিলই না, তখন উহার জায়গায় হয় সমুদ্র, না হয় কতকগুলি দ্বীপ ছিল। তারপর হিমালয় উঁচু হইয়া উঠিল, সমুদ্রও ভরাট হইয়া গেল। আবার কেহ কেহ বলেন যে হিমালয় গোড়া হইতেই ছিল, আর তাহার উত্তর দক্ষিণে সমুদ্র ছিল; আর হিমালয় ক্রমে উঁচু হওয়াতে সমুদ্র বুজিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক ঐ স্থানে প্রাচীনকালের সামুক কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তুর অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। জল যে সেখানে ছিল, আর খুব বেশী পরিমাণে ছিল, তাহাতে ভুল নাই।

অতি প্রাচীনকালে হিমালয় অতি সামান্য পর্ব্বত ছিল, হয়ত ছিলই না। আর আরাবল্লী পর্ব্বত, যাহাকে এখন আমরা নিতান্ত ছোট বলিয়া অবহেলা করি, সে ছিল তখনকার অতি বড় পর্ব্বত। শীত গ্রীষ্ম ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতির তাড়নায় ক্ষয় হইয়া উহা এখন এত ছোট হইয়া গিয়াছে।

এখন আমরা যাহাকে দাক্ষিণাত্য বলি, সেইটাই হয় ত ভারতবর্ষের মধ্যে অতি পুরাতন জায়গা। এই অঞ্চলের আর তাহার আশপাশের পাহাড়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনে হয় যেন পূর্ব্বে ভারতবর্ষের এ সকল স্থান মুড়িয়া একটা খুব উঁচু দেশ ছিল। সে দেশ ক্ষয় পাইয়া ঐ পাহাড় সকলের মাথা গুলিই তাহার কিঞ্চিৎ চিহ্ন রহিয়াছে।

ঘাট পর্ব্বত গুলিও অনেক দিনের পুরাতন। দাক্ষিণাত্য, আর তাহার পূর্ব্ব পশ্চিম দুধারে দুই ঘাট পর্ব্বত,—ঐ স্থানের এইরূপ চেহারা বোধ হয় বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু হিমালয় আর তাহার নিকটের জায়গাগুলির তখন কি অবস্থা ছিল, তাহা বড়ই সন্দেহের বিষয়। ওখানে তখন জল ছিল, তাহাই যদি হয়, তবে তখনকার ভারতবর্ষের চেহারাটা কেমন ছিল, ভাবিয়া দেখ দেখি। অনেক দিন আগে আমি ইহার একটা মোটামুটি নক্সা আঁকিয়া ছিলাম, সেটা দেখিলে কতকটা বুঝিতে পারিবে।

কিন্তু এ নক্সা যে ঠিক তাহা আমি বলিতে পারি না। এক সময়ে ভারতবর্ষ আর আফ্রিকায় যোগ ছিল বলিয়া বোধ হয়, নহিলে জিরাফ হিপপটেমস্ প্রভৃতি আফ্রিকা দেশের জন্তু এ দেশে কেমন করিয়া আসিল? এ সকল জন্তুর হাড় এদেশের পুরাতন মাটিতে পাওয়া যায়; আর বোম্বাইর পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের তলায় প্রাচীনকালের বনের চিহ্নও পাওয়া যায়।

আণ্ডামান আর নিকোবর দ্বীপগুলি এখন সমুদ্রের মাঝখানে, কিন্তু এক সময়ে ব্রহ্ম-দেশের সঙ্গে উহাদের যোগ ছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরে যে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ ছড়ান রহিয়াছে, সেগুলিও না কি কোন কালে একটা মহাদেশের অংশ ছিল, সেই দেশ সমুদ্রে ডুবিয়া এখন ঐ দ্বীপগুলি অবশিষ্ট রহিয়াছে।

জাপান আর ফিলেপাইন দ্বীপের সম্বন্ধেও এরূপ মনে করা হয় যে উহারা এক সময়ে আসিয়া সঙ্গে যুক্ত ছিল।

বাস্তবিক, পৃথিবীর চেহারা আমরা যেমন দেখিতেছি, পূর্ব্বে তাহা তেমন ছিল না। যেখানে দেশ সেখানে সমুদ্র ছিল; যেখানে সমুদ্র, সেখানে দেশ ছিল এরূপ উহার অনেক স্থানেই ঘটিয়াছে। এখনও পৃথিবীর অনেক জায়গার জমি ধীরে ধীরে উঁচু নীচু হইতেছে।

ইটালিতে টেম্প্‌ল্ অব সিরাসীস্ বলিয়া একটি অতি প্রাচীন মন্দির আছে। ইহার নীচের দিকটা এখন জলে ডুবিয়া আছে। ইহার মেঝে খুঁড়িলে তাহার ৪।৫ ফুট নীচে

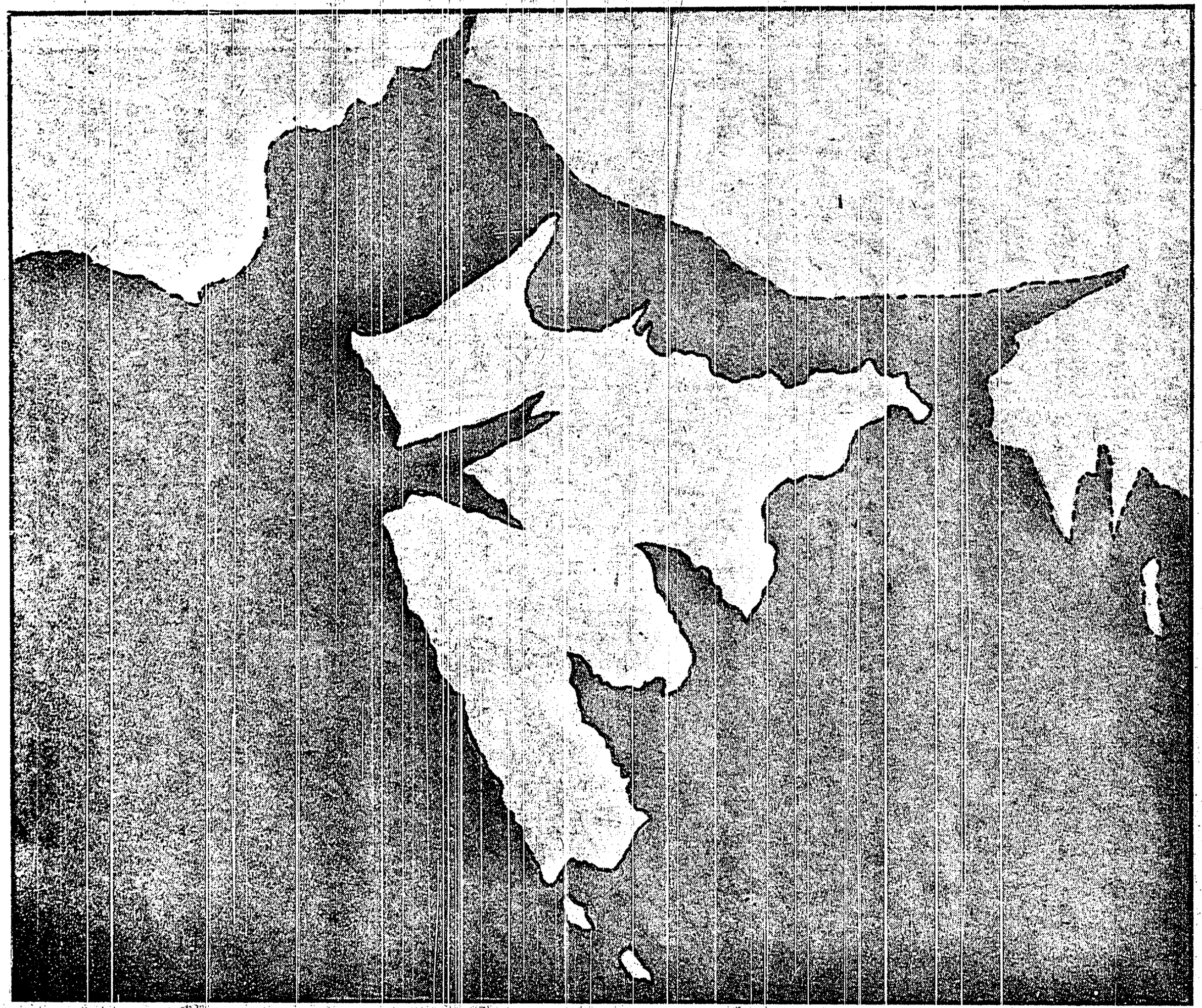

প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ।

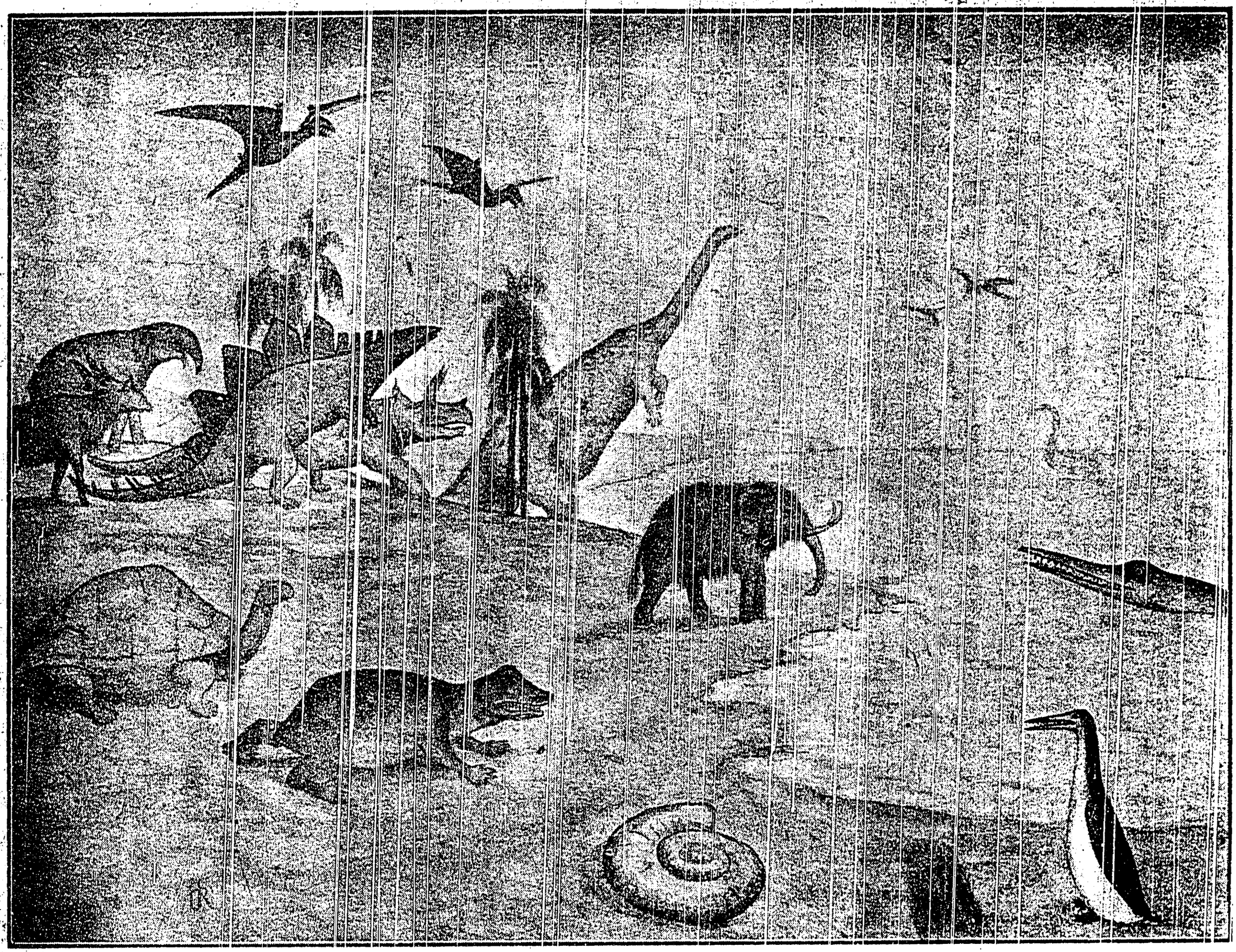

কয়েকটি প্রাচীন কালের জন্তু।

(বিভিন্ন সময়ের)।

আর একটা মেঝে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইটাই উহার আসল মেঝে ছিল। তার পর ক্রমে জমি বসিয়া সে মেঝেয় জল উঠাতে উহার উপরে আর একটা মেঝে করাইতে হয়। প্রাচীন পুস্তকে এই মন্দিরের কথা আছে, কিন্তু উহা যে জলে ডোবা, এমন কোন কথা নাই। তাহাতে খালি লেখে যে মন্দিরটি সমুদ্রের ধারে।

মন্দিরের যতদূর অবধি জল উঠে ঠিক সেইখানে দেওয়ালের গায়ে পোকায় গর্ত্ত করে। এখন সেই মন্দিরের যেখানে জল আছে, তাহার অনেক উপরে অবধি এইরূপ পোকার দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এক সময়ে জমি বসিয়া মন্দিরের ঐ স্থান অবধি জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, তার পর জমি উঁচু হওয়াতে জল সরিয়া গিয়াছে।

সুইডেন আর নরওয়ের অনেক স্থান এইরূপে একটু একটু করিয়া উঁচু হইতেছে। সেখানকার সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের গায় দাগ কাটিয়া এই বিষয়ের পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে ১৪ বৎসরে সেখানকার জমি ৪ ইঞ্চি উঁচু হইয়াছে।

আর কত বলিব? এরূপ পরিবর্ত্তন পৃথিবীময়ই চলিয়াছে। যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই; কালে জানি আবার কি রকম হইবে।

কেবল উহার জল স্থলের চেহারাই যে বদলাইয়াছে, তাহা নহে, আসল জিনিসটাই এক রকম ছিল আরেক রকম হইয়া গিয়াছে। এমন সময় ছিল, যখন এই সব গাছ পালা, নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত কিছুই ছিল না, পৃথিবীটা একটা আগুনের গোলার মত জ্বলিত; সেই জিনিস ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। এখন তাহাতে ফুল ফোটে, ঝরণা খেলে আর জীবজন্তু সুখে বাস করে।

এ সকল জীবজন্তুই কি চিরদিন এইরূপ ছিল? আগে এ সকল জন্তুর প্রায় কোনটাই ছিল না; সেই প্রাচীন কালের জন্তু সকলই লোপ পাইয়াছে। কি অদ্ভুত জীবই যে তাহারা ছিল, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

সেকালের কুমীর আর গোসাপ এক একটা ৫০।৬০ হাত লম্বা হইত, তাহাদের অনেকে আবার পাখীর মতন করিয়া দু'পায় চলিত। পাখীর মুখে কুমীরের মতন দাঁত হইত; তাহার ডানায় পালকও থাকিত, আবার ধারাল নখও থাকিত। হাতীর গায় ভালুকের মত লোম থাকিত, আর কুমীরের বাদুড়ের মতন ডানা হইত। ব্যাঙের মত জন্তু, সে হইত ষাঁড়ের মত বড়, আর এক একটা শামুক হইত যেন এক একটা গাড়ীর চাকা।

জোলা আর সাত ভূত।

এক জোলা ছিল, সে পিঠে খেতে বড় ভালবাস্‌ত।

একদিন সে তার মাকে বল্ল, "মা, আমার বড্ড পিঠে খেতে ইচ্ছে কর্‌ছে; আমাকে পিঠে করে দাও।"

সেই দিনই তার মা তাকে লাল লাল, গোল গোল, চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা সাতখানি চমৎকার পিঠে করে দিল। জোলা সেই পিঠে পেয়ে ভারি খুসী হয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌ল আর বল্‌তে লাগ্‌ল,

"একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!"

জোলার মা বল্ল, "খালি নাচ্‌বিই যদি, তবে খাবি কখন?"

জোলা বল্ল, "খাব কি এখানে? সবাই যেখানে দেখ্‌তে পাবে, সেইখানে গিয়ে খাব!"

বলে জোলা পিঠেগুলি নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, আর বল্‌তে লাগ্‌ল,

"একটা খাব, দুটো খাব
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!"

নাচ্‌তে নাচ্‌তে জোলা একেবারে সেই বটগাছ তলায় চলে এল, যেখানে হাট হয়। সেই গাছের তলায় এসে সে খালি নাচ্‌ছে আর বল্‌ছে,

"একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!"

এখন হয়েছে কি,—সেই গাছে সাতটা ভূত থাক্‌ত। জোলা 'সাত বেটাকে চিবিয়ে খাব' বল্‌ছে, তার তা শুনে তাদের ত বড্ডই ভয় লেগেছে। তারা সাত জনে গুটীশুটী হয়ে কাঁপছে, আর বল্‌ছে,

"ওরে সর্ব্বনাশ হয়েছে! ঐ দেখ্‌, কোত্থেকে এক বিট্‌কেল ব্যাটা এসেছে, আর বল্‌ছে আমাদের সাত জনকেই চিবিয়ে খাবে! এখন কি করি বল্‌ত!"

অনেক ভেবে তারা একটা হাঁড়ি নিয়ে জোলার কাছে এল। এসে যোড় হাত করে তাকে বল্ল,

"দোহাই কর্ত্তা! আমাদের চিবিয়ে খাবেন না। আপনাকে এই হাঁড়িটি দিচ্ছি, এইটী নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন!"

সাতটা মিস্‌মিসে কালো তালগাছপানা ভূত, তাদের কুলোর মত কান, মূলোর মত দাঁত, চুলোর মত চোখ,—তারা জোলার সাম্‌নে এসে কাঁই মাঁই করে কথা বল্‌ছে। দেখেইত সে এমনি চম্‌কে গেল যে সেখান থেকে ছুটে পালাবার কথা তার মনেই এল না। সে বল্ল,

"হাঁড়ি নিয়ে আমি কি কর্‌ব!"

ভূতেরা বল্ল, "আজ্ঞে, আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে, তাই এই হাঁড়ির ভিতর পাবেন।"

জোলা বল্ল, "বটে? আচ্ছা আমি পায়েস খাব।"

বল্‌তে বল্‌তেই সেই হাঁড়ির ভিতর থেকে চমৎকার পায়েসের গন্ধ বেরুতে লাগ্‌ল। তেমন পায়েস জোলা কখনো খায়নি, তার মাও খায়নি, তার বাপও খায়নি। কাজেই জোলা যারপর নাই খুসী, হয়ে হাঁড়ি নিয়ে সেখান থেকে চলে এল, আর ভূতেরা ভাব্‌ল, "বাবা! বড্ড বেঁচে গিয়েছি!"

তখন বেলা অনেক হয়েছে, আর জোলার বাড়ী সেখান থেকে ঢের দূরে। তাই জোলা ভাব্‌ল, "এখন এই রোদে কি করে বাড়ী যাব? বন্ধুর বাড়ী কাছে আছে, এবেলা সেইখানে যাই; তার পর বিকালে বাড়ী যাব এখন।"

বলে সে ত তার বন্ধুর বাড়ী এসেছে। সে হতভাগা কিন্তু ছিল ভারি দুষ্টু। সে জোলার হাঁড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "হাঁড়ি কোত্থেকে আন্‌লি রে?"

জোলা বল্ল, "বন্ধু, এ যেসে হাঁড়ি নয়, এর ভারি গুণ।"

বন্ধু বল্ল, "বটে? আচ্ছা দেখি ত কেমন গুণ।"

জোলা বল্ল, "তুমি যা খেতে চাও, তাই আমি এর ভিতর থেকে বার করে দিতে পারি।"

বন্ধু বল্ল, "আমি রাবড়ী, সন্দেশ, রসগোল্লা, সরভাজা, মালপুয়া, পান্তুয়া, কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গজা, মতিচূর, জিলিপি, অমৃতি, বরফী, চম্‌চম্ এই সব খাব।"

জোলার বন্ধু যা বল্‌ছে, জোলা হাঁড়ির ভিতরে হাত দিয়ে তাই বার করে আন্‌ছে। এসব দেখে তার বন্ধু ভাব্‌ল যে 'এ জিনিসটি চুরী না কর্‌লে হচ্ছে না।'

তখন সে জোলাকে কতই আদর কর্‌তে লাগ্‌ল। পাখা এনে তাকে হাওয়া কর্‌ল, গামছা দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল, আর বল্ল,

"আহা ভাই, তোমার কি কষ্টই হয়েছে! গা দিয়ে ঘাম বেয়ে পড়্‌ছে! একটু ঘুমোবে ভাই? বিছানা করে দিব?"

সত্যি সত্যিই জোলার তখন ঘুম পেয়েছিল; কাজেই সে বল্ল, "আচ্ছা, বিছানা করে দাও।"

তখন তার বন্ধু বিছানা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে, তার হাঁড়িটি বদ্‌লে তার জায়গায় ঠিক তেমনি ধরণের আর একটা হাঁড়ি রেখে দিল। জোলা তার কিছুই জানে না, সে বিকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ী চলে এসেছে আর তার মাকে বল্‌ছে, "দেখ মা, কি চমৎকার এক হাঁড়ি এনেছি। তুমি কি খাবে মা? সন্দেশ খাবে? পিঠে খাবে? দেখ আমি এর ভিতর থেকে সব বার করে দিচ্ছি।"

কিন্তু এ ত আর সে হাঁড়ি নয়, এর ভিতর থেকে সে সব জিনিষ বেরুবে কেন? মাঝ-খান থেকে জোলা বোকা ব'নে গেল, তার মা তাকে বক্‌তে লাগ্‌ল।

তখন ত জোলার বড্ড রাগ হয়েছে, আর সে ভাব্‌ছে 'সেই ভূত ব্যাটাদেরই এ কাজ।' তার বন্ধু যে তাকে ঠকিয়েছে, একথা তার মনেই হল না।

কাজেই পরদিন সে আবার সে বটগাছ তলায় গিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল,

"একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব।"

তা শুনে আবার ভূতগুলো কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে একটা ছাগল নিয়ে এসে তাকে হাত যোড় করে বল্ল,

"মশাই গো! আপনার পায়ে পড়ি। এই ছাগলটা নিয়ে যান, আমাদের ধরে খাবেন না।"

জোলা বল্ল, "ছাগলের কি গুণ?"

ভূতেরা বল্ল, "ওকে শুড়্‌শুড়ি দিলে ও হাসে আর ওর মুখ দিয়ে খালি মোহর পড়ে।"

অমনি জোলা ছাগলের গায় শুড়শুড়ি দিতে লাগ্‌ল, আর ছাগলটাও 'হিহি হিহি' করে হাস্‌তে লাগল, আর তার মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে খালি মোহরই পড়্‌তে লাগ্‌ল। তা দেখে জোলার মুখে ত আর হাসি ধরে না। সে ছাগল নিয়ে ভাব্‌ল যে এ জিনিসটি বন্ধুকে না দেখালেই নয়।

সে দিন তার বন্ধু তাকে আরো চমৎকার বিছানা করে দিয়ে, দুহাতে দুই পাখা নিয়ে হাওয়া করল। জোলার ঘুমও হল তেমনি। সে দিন আর সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙ্গ্‌লই না। তার বন্ধু ত এর মধ্যে কখন তার ছাগল চুরী করে তার জায়গায় আর একটা ছাগল রেখে দিয়েছে!

সন্ধ্যার পরে জোলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তার বন্ধুর সেই ছাগলটা নিয়ে বাড়ী এল; এসে দেখ্‌ল যে তার মা তার দেরী দেখে ভারি চটে আছে। তা দেখে সে বল্ল, "রাগ আর করতে হবে না মা; আমার ছাগলের গুণ দেখ্‌লে খুসী হয়ে নাচ্‌বে!" বলেই সে ছাগলের বগলে আঙ্গুল দিয়ে বল্ল, "কাঁতু কুঁতু কুতু কুতু কুতু!"

ছাগল কিন্তু তাতে হাস্‌লও না, তার মুখ দিয়ে মোহরও বেরুল না। জোলা আবার তাকে শুড়্‌শুড়ি দিয়ে বল্ল, "কাঁতু কুঁতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!"

তখন সে ছাগল রেগে গিয়ে সিং বাগিয়ে তার নাকে এমনি বিষম গুঁতা মার্‌ল যে সে চিৎ হয়ে পড়ে চ্যাঁচাতে লাগল। আর তার নাক দিয়ে রক্তও পড়্‌ল প্রায় আধ সের তিন পোয়া। তার উপর আবার তার মা তাকে এমন বকুনি দিল যে তেমন বকুনি সে আর খায়নি।

তাতে জোলার রাগ যে হল, সে আর কি বল্‌ব। সে আবার সেই বটগাছ তলায় গিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল,

"একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!

বেটারা আমাকে দুবার দুবার ফাঁকি দিয়েছিস্, ছাগল দিয়ে আমার নাক থেৎলো কে দিয়েছিস্,—আজ আর তোদের ছাড়্‌ছিনে !”

ভূতেরা তাতে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, “সে কি মশাই, আমরা কি করে আপনাকে ফাঁকি দিলুম, আর ছাগল দিয়েই বা কি করে আপনার নাক থেৎলো করলুম ?”

জোলা তার নাক দেখিয়ে বল্ল,“এই দেখ্‌না, গুঁতো মেরে সে আমার কি দশা করেছে তোদের সব কটাকে চিবিয়ে খাব !”

ভূতেরা বল্ল, “সে কখনো আমাদের ছাগল নয়। আপনি কি এখান থেকে সোজাসুজি বাড়ী গিয়েছিলেন ?”

জোলা বল্ল, “না, আগে বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলুম। সেখানে খানিক ঘুমিয়ে তার প বাড়ী গিয়েছিলুম।”

ভূতেরা বল্ল, “তবেই ত হয়েছে ! আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময়ে আপনা বন্ধু আপনার ছাগল চুরী করেছে।”

একথা শুনেই জোলা সব বুঝ্‌তে পারল। সে বল্ল, “ঠিক, ঠিক ! সে বেটাই আম হাঁড়ীও চুরী করেছে, ছাগলও চুরী করেছে। এখন কি হবে ?”

ভূতেরা তাকে এক গাছি লাঠি দিয়ে বল্ল “এই লাঠি আপনার হাঁড়িও এনে দি ছাগল ও এনে দিবে। ওকে শুধু একটি বার আপনার বন্ধুর কাছে নিয়ে বল্‌বেন, ‘লা লাগত !’ তা হ’লে দেখবেন, কি মজা হবে। লাখ লোক যুটে এলেও এ লাঠির স পার্‌বে না, লাঠি তাদের সকলকে পিটে ঠিক করে দিবে।”

জোলা তখন সেই লাঠিটি বগলে করে তার বন্ধুকে গিয়ে বল্ল, “বন্ধু, একটা দেখ্‌বে ?”

বন্ধুত ভেবেছে না জানি কি মজা হবে। তার পর যখন জোলা বল্ল, ‘লাঠি লাগ তখন সে এমনি মজা দেখ্‌ল, যেমন তার জন্মে আর কখনো দেখেনি। লাঠি তাকে পিটে তার মাথা থেকে পা অবধি চামড়া তুলে ফেল্ল। সে ছুটে পালাল, লাঠি তার সঙ্গে গিয়ে তাকে পিট্‌তে পিট্‌তে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাত করে বল্ল, “তোর পায়ে পড়ি ভাই, তোর হাঁড়ি নে, তোর ছাগল নে, আমাকে ছেড়ে

জোলা বল্ল, “আগে ছাগল আর হাঁড়ি আন্, তবে তোকে ছাড়্‌ব।”

কাজেই বন্ধুমশাই আর কি করেন ? সেই পিটুনি খেতে খেতেই হাঁড়ি আর ছ এনে হাজির কর্‌লেন। জোলা হাঁড়ি হাতে নিয়ে বল্ল, “সন্দেশ আসুক ত”।

ছাঁড়ি সন্দেশে ভরে গেল। ছাগলকে শুড়শুড়ি দিতে না দিতেই সে হো হো করে হেসে ফেল্লে, আর তার মুখ দিয়ে চার শ টা মোহর বেরিয়ে পড়্ল। তখন সে তার লাঠি হাঁড়ি আর ছাগল নিয়ে বাড়ী চলে এল।

এখন আর জোলা গরীব নাই, সে বড়মানুষ হয়ে গেছে। তার বাড়ী, তার গাড়ী, হাতী ঘোড়া খাওয়া পরা চাল চলন, লোকজন সব রাজার মতন। দেশের রাজা তাকে যার পর নাই খাতির করেন; তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন ভারি কাজে হাত দেন না।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, আর কোন দেশের এক রাজা হাজার হাজার লোক জন নিয়ে এসে সেই দেশ লুট্তে লাগ্ল। রাজার সিপাইদের মেরে খোঁড়া করে দিয়েছে, এখন রাজার বাড়ী লুটে কখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নাই।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি জোলাকে ডাকিয়ে বল্লেন, "ভাই, এখন কি করি বল ত? বেঁধেই ত নিবে দেখ্ছি।"

জোলা বল্ল, আপনার কোন ভয় নাই। আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

বলেই সে তার লাঠিটি বগলে করে রাজার সিংহ দরজার বাইরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। বিদেশী রাজা লুট্তে লুট্তে সেই দিকেই আস্ছে, তার সিপাই আর হাতী ঘোড়ার গোলমালে কাণে তালা লাগ্ছে, ধূলায় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। জোলা খালি চেয়ে দেখ্ছে, কিছু বলে না।

বিদেশী রাজা পাহাড়ের মতন এক হাতী চড়ে সকলের আগে আগে আস্ছে, আর ভাব্ছে সব লুটে নিবে। আর, জোলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাব্ছে আর একটু কাছে এলেই হয়।

তার পর তারা যেই কাছে এসেছে, অমনি জোলা তার লাঠিকে বল্ল, "লাঠি, লাগত!"

আর যাবে কোথায়? তখনি এক লাঠি লাখ লাখ লাঠি হয়ে রাজা আর তার লোক-জন আর তার হাতী ঘোড়া সকলের ঘাড়ে গিয়ে পড়্ল। আর পিটুনী যে কেমন দিল সে যারা সে পিটুনী খেয়েছিল তারাই বল্তে পারে।

পিটুনী খেয়ে রাজা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বল্ল, "আর না বাবা, আমাদের ঘাট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও আমরা দেশে চলে যাই।"

জোলা কিছু বলে না, খালি চুপ করে চেয়ে দেখ্ছে আর একটু একটু হাস্ছে।

শেষে রাজা বল্ল, "তোমাদের যা লুটেছি, সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার রাজ্য দিচ্ছি, দোহাই বাবা! ছেড়ে দাও।"

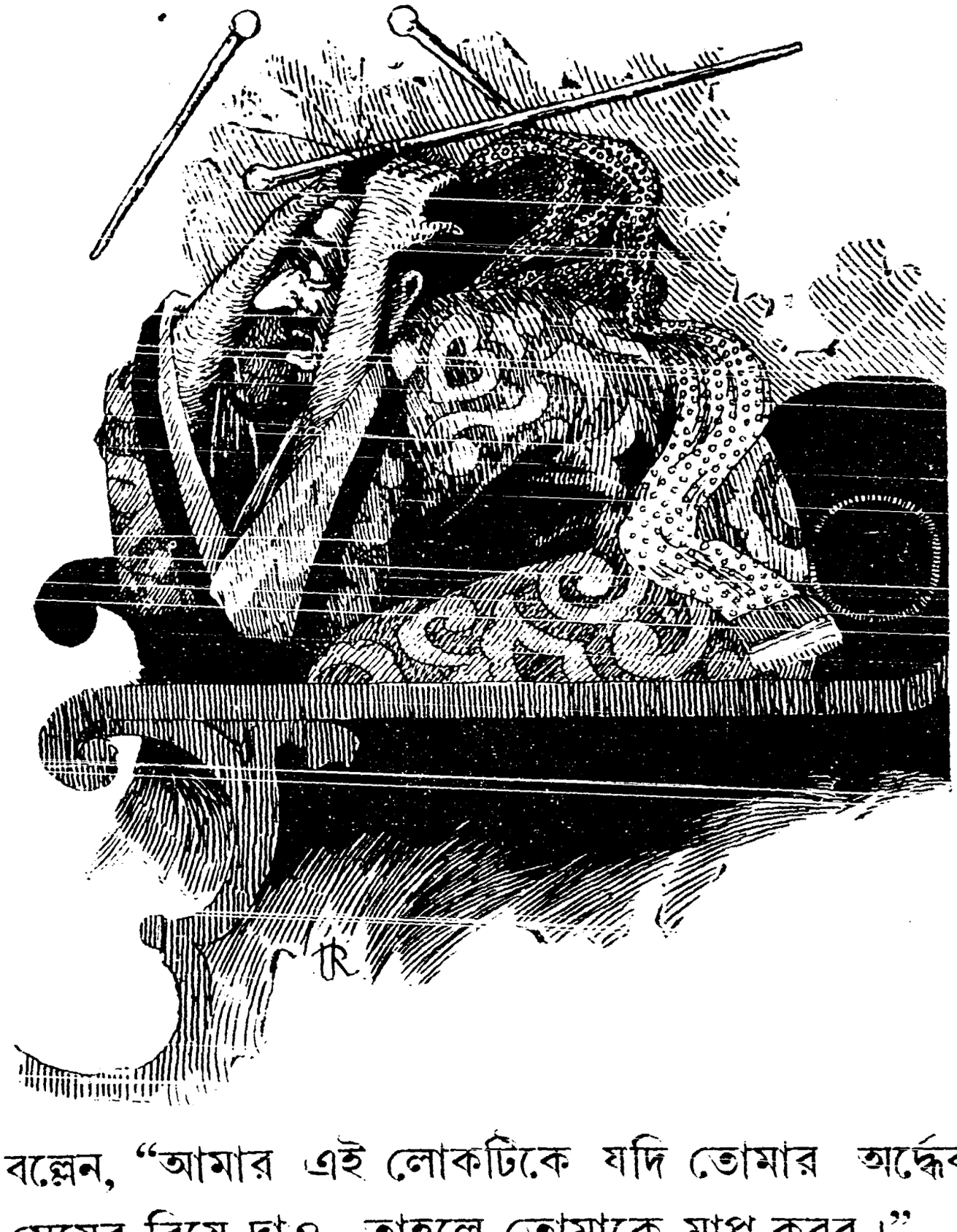

তখন জোলা গিয়ে তার রাজাকে বল্ল, "রাজা মশাই, সব ফিরিয়ে দিবে বল্‌ছে আর তাদের রাজ্যও আপনাকে দিবে বল্‌ছে, আর বল্‌ছে দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও। এখন কি হুকুম হয়!"

রাজা মশাই বল্লেন, "তা'হলে ছেড়ে দাও গিয়ে।"

রাজা মশাইয়ের কথায় জোলা তার লাঠি থামিয়ে দিল। তারপর বিদেশী রাজা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে রাজা মশাইয়ের পায় পড়ে মাপ চাইল।

রাজা মশাই জোলাকে দেখিয়ে বল্লেন, "আমার এই লোকটিকে যদি তোমার অর্দ্ধেক রাজ্য দাও, আর তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তাহলে তোমাকে মাপ কর্‌ব।"

সে ত তার সব রাজ্যই দিতে চেয়েছিল। কাজেই জোলাকে তার অর্দ্ধেক রাজ্য আর মেয়ে দিতে তখনি রাজি হল।

তারপর জোলা সেই অর্দ্ধেক রাজ্যের রাজা হল, আর রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আর ভোজের কি যেমন তেমন ঘটা হল! সে ভোজ খেয়ে যদি তারা শেষ করতে না পেরে থাকে, তবে হয়ত এখনো খাচ্ছে। সেখানে একবার যেতে পার্‌লে হত।

প্রথম জজ্ঞ

দ্বিতীয় জজ্ঞ

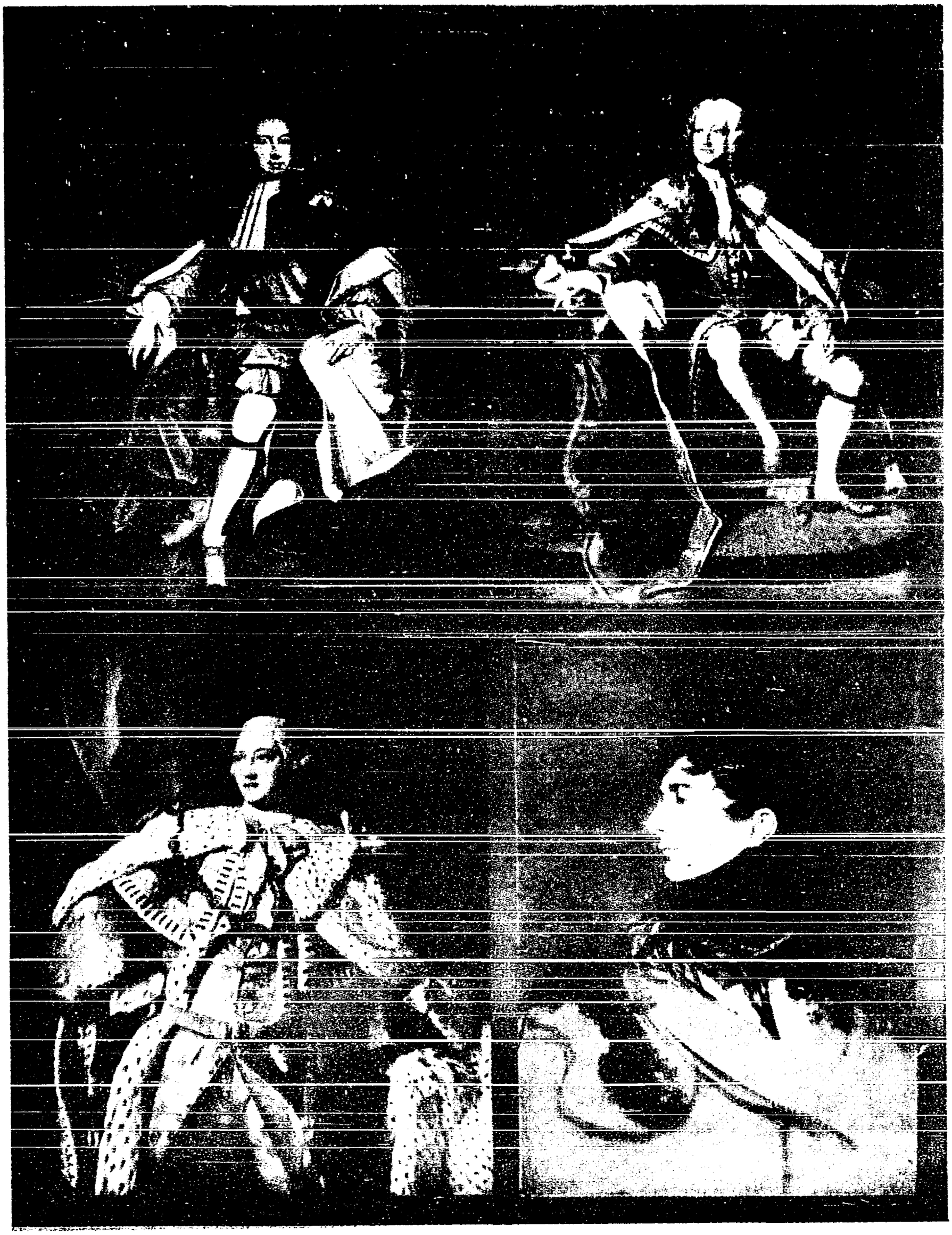

তৃতীয় জজ্ঞ

চতুর্থ জজ্ঞ ।

PRINTED BY . HAI & SONS CALCUTTA

তারা।

আকাশে ঐযে ছোট ছোট জিনিসগুলি হীরার মতন ঝিকমিক করে, সেগুলিকে আমরা তারা বলি। বোধ হয় তোমরা এত দিনে 'ধ্রুব তারা' চিনিয়াছ। যদি না চিনিয়া থাক, তবে একটু পরিশ্রম করিয়া উহার সহিত পরিচয় করিয়া লও। 'সপ্তর্ষি মণ্ডল'কে আজ কাল সন্ধ্যার সময় উত্তর দিকে দেখা যায়; উহার সাহায্যে কি করিয়া ধ্রুব তারাকে বাহির করিতে হয়, গত বারে তাহা বলিয়াছি।

সাতটি তারা লইয়া এই সপ্তর্ষি মণ্ডল। ইংরাজিতে ইহাকে বলে 'বড় ভল্লুক' (Great bear), বা 'চার্লসের গাড়ী (Charles' wain) বা 'লাঙ্গল' (the plough)। সাতটা তারা মিলিয়া কতকটা লাঙ্গলের চেহারার মতন হইয়াছে বৈ কি; তবে সেটা আমাদের দেশী লাঙ্গল নয়, বিলাতী লাঙ্গল। ঠেলা গাড়ীর চেহারাও কতকটা আসে; চারিটা তারা যেন গাড়ীর খোল, আর তিনটা যেন তাহার ডাণ্ডা। আর, একটু ভাবিয়া দেখিলে ঐ চারিটা তারাকে ভালুকের শরীর, আর তাহার পিছনের তারা তিনটিকে ভালুকের লেজ মনে করিয়া লইতেও বেশী মুস্কিল হইবে না। সাবেক মানুষের মন বোধ হয় আমাদের চেয়ে শাদা সিধা, আর তাহাদের কল্পনাশক্তি খুব প্রখর ছিল। তাহারা উহার ভিতরেই বেশ ভালুক দেখিতে পাইত।

এইরূপ, বড় ভাল্লুক, ছোট ভাল্লুক (যাহার লেজের আগায় ধ্রুবতারা), বড় কুকুর, ছোট কুকুর, ভেড়া, ষাঁড়, কাঁকড়া, বিছে, গাড়ী, জাহাজ প্রভৃতি কতই জিনিসের চেহারা লোকে তারাগুলির ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। আর তাহাতে কাজের সুবিধাও হইয়াছে। একটা নাম বলিলেই অমনি কতকগুলি তারাকে চিনিয়া ফেলা যায়। এ সকলের সহিত আমাদের ক্রমে পরিচয় করিতে হইবে। আজ এ বিষয়ে খালি একটা কথা বলিবার আছে।

এই তারাগুলির প্রত্যেকের এক একটা জায়গা আছে, সেই খানেই তাহারা বসিয়া থাকে; নহিলে উহাদিগকে চিনিবারই উপায় থাকিত না। যদি তাহারা নিজের ইচ্ছামত নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইত, তবে আজ যে সাতটি তারা মিলিয়া ভালুক বা গাড়ীর চেহারার মত হইয়াছে, কাল তাহারা সরিয়া গিয়া হয় ত ঘটি বাটির মত হইয়া যাইত।

যাহা হউক, এরূপ তারাও যে একেবারে নাই, এমন নহে। আজ কাল খুব ভোরের সময় পূর্ব্বের আকাশে একটা খুব বড় তারা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি উহার উপরে নজর রাখ থাক তবে দেখিবে যে সে আকাশের এক জায়গায় স্থির থাকে না।

উহাকে আর কোন একটি তারার সহিত মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সে ধীরে ধীরে জায়গা বদলায়। এই তারাটির নাম 'শুক্র' বা 'সুখতারা'।

এই তারাটি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় তাই একবার সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে আর একবার সূর্য্যের পশ্চিমে আমরা তাহাকে দেখিতে পাই। সকল তারার বড় তারা এই 'শুক্র' কাজেই ইহার উপরে সহজেই চোখ পড়ে, আর ইহার স্বভাব জানিতে ও বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না। এইরূপ আরো অনেকগুলি তারা আছে, যাহারা সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে; ইহাদিগকে 'গ্রহ' বলে; আমাদের পৃথিবীও এইরূপ একটী 'গ্রহ', আর ছয়টির নাম বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইয়ুরেনস্ আর নেপচুন। সূর্য্যের নিকট হইতে হিসাব করিলে সকলের আগে বুধ, তারপর ক্রমে শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ আর নেপচুন। ইহাদের মধ্যে বুধ শুক্র আর মঙ্গল ছাড়া আর সব কয়টিই পৃথিবীর চেয়ে বড়।

প্রাচীন কালের লোকেরা ইউরেনস্ আর নেপ্চুনের কথা জানিত না কারণ এই তারা দুটিকে দূরবীক্ষণ ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইহাদের কথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই জানা ছিল। তাহার প্রমাণ এই দেখনা,—— আমাদের সাতটি বারের মধ্যে পাঁচটিই ইহাদের নামে, আর দুটি চন্দ্র আর সূর্য্যের নামে।

সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি,—আমাদের পঞ্জিকামতে ইহারা সকলেই গ্রহ। কিন্তু আজকালকার হিসাবে ইহাদের কেবল মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র আর শনি 'গ্রহ,' সূর্য্য 'নক্ষত্র', আর চন্দ্র 'উপগ্রহ'।

অর্থাৎ, সূর্য্যের চারিদিকে যাহারা ঘোরে, তাহারা গ্রহ; গ্রহদের চারিদিকে যাহারা ঘোরে তাহারা উপগ্রহ। আমাদের পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে, সুতরাং সে উপগ্রহ। এইরূপ উপগ্রহ মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি, ইউরেনস্, আর নেপ্চুনের ও অনেকগুলি করিয়া এ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। আরো যে নাই, এমন কথাও বলা যায় না; দূরবীক্ষণ যত ভাল ভাল প্রস্তুত হইতেছে, ততই আকাশে নূতন নূতন জিনিস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আবার ফটোগ্রাফী বিদ্যার এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে, যাহা দূরবীণে দেখা যায় না, ফটোগ্রাফীর কাছে তাহাও ধরা পড়ে।

যখন দূরবীক্ষণ ছিল না, তখন এ সব বিষয়ে অতি অল্প কথাই জানিবার উপায় ছিল গ্যালিলিও নামক ইটালী দেশীয় পণ্ডিত সকলের আগে দূরবীক্ষণ দিয়া আকাশ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার দূরবীণটি যে খুব ভাল ছিল তাহা নহে। আজ কাল ৩০।৪০ টাক

দিলেই সেরূপ দূরবীণ কিনিতে পাওয়া যায়। গ্যালিলিয়োর দূরবীণে একটা জিনিসকে হাজার গুণ বড় দেখা যাইত কিনা সন্দেহ; আর, আজ কালকার খুব বড় বড় দূরবীণের একটাতে ৯০০০০০০ গুণ পর্য্যন্ত বড় দেখাইতে পারে।

তথাপি গ্যালিলিও যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। চন্দ্রে পাহাড় আছে, একথা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বৃহস্পতির চারিটি চন্দ্রও তাঁহার দূরবীক্ষণে দেখা গিয়াছিল। শুক্র গ্রহের যে চন্দ্রের মতন ক্ষয় বৃদ্ধি আছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শনি গ্রহটাঁকে লইয়া তিনি একটু গোলে পড়িয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যেন সেটা কতকটা পাগড়ীর মতন; উহার ভিতরে আর কি আছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

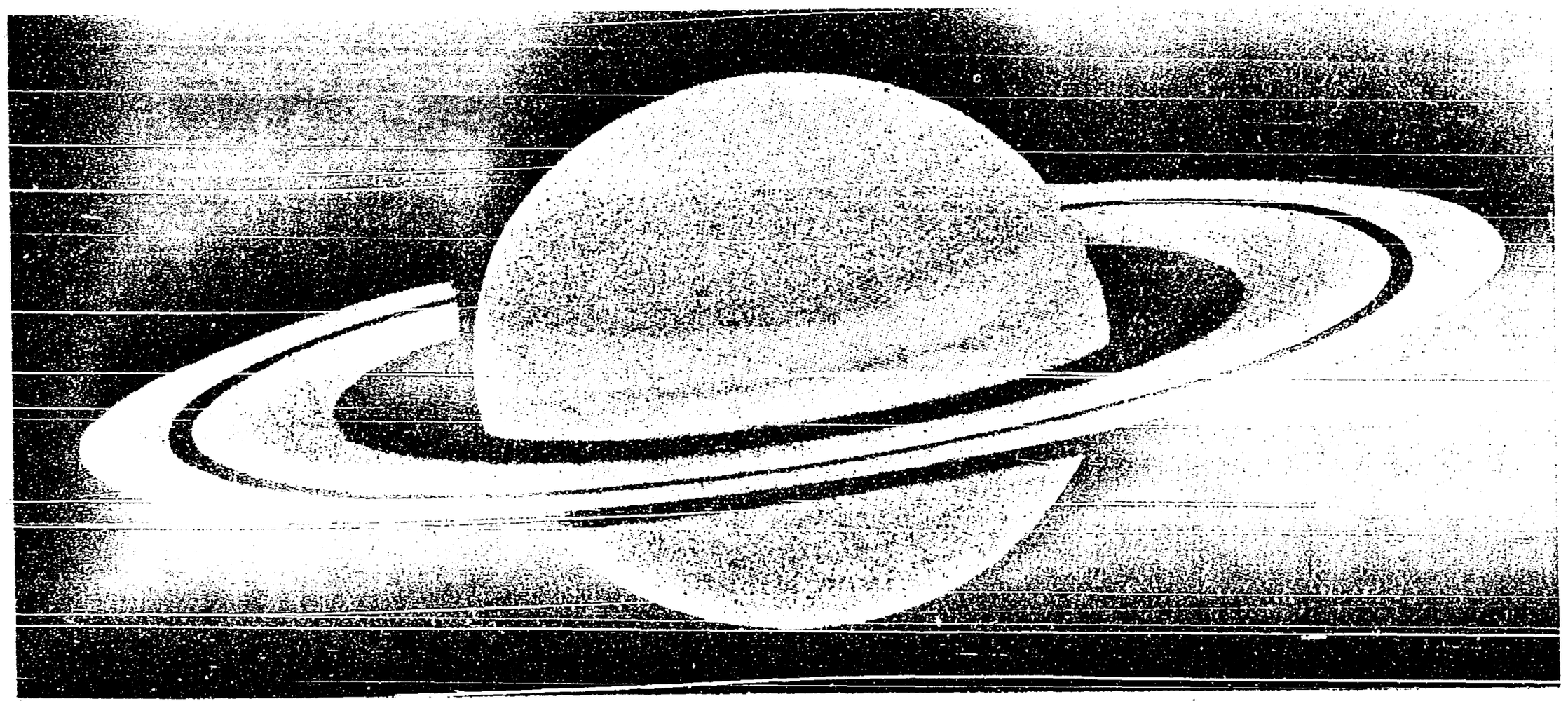

শনি গ্রহ।

দূরবীণ দিয়া গ্রহ আর নক্ষত্রের প্রভেদ ভারি পরিষ্কার দেখা যায়। গ্রহগুলি আমাদের কাছে। দূরবীণ যত ভাল হয়, আমরা গ্রহগুলিকে ততই বড়, আর তাহার ভিতরকার খুঁটিনাটি ততই পরিষ্কার দেখিতে পাই। কিন্তু নক্ষত্রগুলি এতই দূরে, যে কোন দূরবীণেই তাহাদিগকে এক একটি বিন্দু ছাড়া আর কিছুর মতন দেখা যায় না। অথচ এই সকল নক্ষত্রের এক একটা আমাদের সূর্য্যের চেয়ে ও ঢের বড়।

যে সকল গ্রহের নাম করা হইল, তাহা ছাড়া আরো প্রায় হাজার খানেক ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রহ আছে। এগুলি এতই ছোট যে দূরবীণ দিয়াও ইহাদের সকল গুলিকে ভাল করিয়া

দেখা যায় না। আমাদের বাঙ্গালা দেশের একটি ছোট জেলায় যতটুকু স্থান, ছোট ছোট ক্ষুদে গ্রহগুলিতে বোধ হয় ততটুকু জায়গাও নাই। শনি আর বৃহস্পতি, এই দুটি গ্রহের মাঝখানে এই ক্ষুদ্র গ্রহগুলির স্থান।

গ্রহ যেমন সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি এমন তারাও আছে যে সেটা আর একটা তারার চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। তবে যে তাহার একটাকে গ্রহ বলা যায় না, তাহার কারণ এই যে উহাদের দুটাই সূর্য্য। সূর্য্যের নিজের তেজ থাকে,—সে আগুনের মতন জ্বলে। গ্রহগুলির নিজের তেমন তেজ দেখা যায় না, কেবল সূর্য্যের আলোক তাহাদের উপরে পড়াতেই তাহারা ঝক্‌ঝক্ করে।

কতকগুলি তারাকে দূরবীণ দিয়া দেখিলে ধোঁয়ার মতন দেখা যায়। সে গুলি এখনও মেঘের মতন রহিয়াছে, আজও জমাট বাঁধে নাই। এগুলির নাম নীহারিকা।

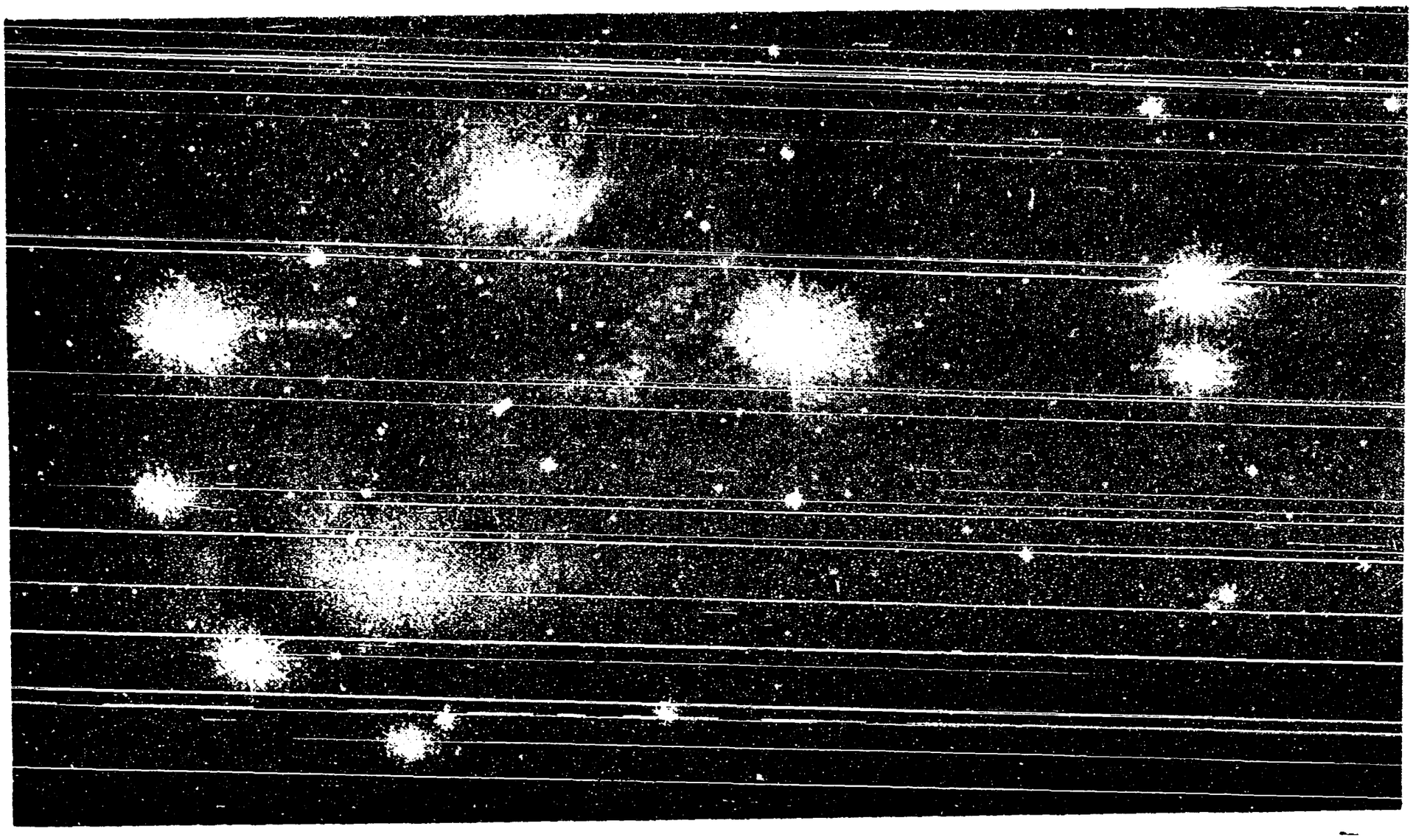

নীহারিকা।

অনেক সময় ধূমকেতুকে ও দূর হইতে তারার মতন দেখা যায়। উহাদের সে ঝাঁটার মতন লেজটি উহারা সূর্য্যের কাছে না আসিলে বাহির করে না।

আর, যে তারাগুলি বোঁ করিয়া ছুট দেয়, সেগুলি যে তারা নয়, এ কথা ত আম সকলেই জানি। ও সব পাথর বা লোহার ডেলা মাত্র; আকাশে ও রকম বিস্তর আছে

অমনি আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। পৃথিবীর কাছে আসিলে, বাতাসের ঘষায় তাহারা জ্বলিয়া উঠে, তখনই তাহারা আমাদের চোখে পড়ে। ইহাদের নাম 'উল্কা'।

তবেই দেখা যাইতেছে যে আমরা মোটের উপর যে জিনিসগুলিকে তারা বলি, তাহার কোনটা সূর্য্য বা নক্ষত্র, কোনটা গ্রহ, কোনটা নীহারিকা, কোনটা ধূমকেতু, কোনটা উল্কা।

হাবুর বাবুগিরি।

এক ছিল ধোপা তার নাম হাবু। তার ছিল এক গাধা। ধোপারা যেমন গাধার পীঠে কাপড়ের বস্তা দিয়ে নিয়ে যায় সেও তেমনি কর্‌ত। তাই নিয়ে তার গিন্নী কত ঠাট্টা কত বকাবকি কর্‌ত তার ঠিক নেই। বল্‌ত "দেখ রাজবাড়ীর ধোপার কেমন সুন্দর ঘোড়া—সে ঘোড়ায় করে কাপড় নিয়ে যায় তার ছেলেরাও কখন কখন তার উপর সওয়ার হয়ে বেড়িয়ে ব্যাড়ায় আর তোমার কিনা এই গাধা নিয়েই কারবার—তোমার হ'ল কি?" সে বেচারা গিন্নীর লাঞ্ছনায় তিতি বিরক্ত হয়ে স্থির কর্‌লে এবার যেন তেন প্রকারেণ একটা ঘোড়া কিনতে হবে। এক মাসে তার অনেক কষ্টে ৫টি টাকা জমেছিল সেই টাকা কটি হাতে করে বাজারময় ঘুরে ব্যাড়াতে লাগ্‌ল। যার কাছে ঘোড়া কেনবার কথা বলে সেই তাকে হাঁকিয়ে দেয়—বলে, "৫ টাকায় আবার ঘোড়া কিন্‌তে এসেছে, মিন্‌সের রকম দেখনা?"

সে মুখ চূন করে বাড়ী ফিরছে এমন সময় একজন নাপিতের সঙ্গে দেখা হল। নাপিত জিজ্ঞাসা কর্‌লে "কেন ভাই তোমার কি হয়েছে? অমন মুখভার করে চলেছ কোথায়?" হাবু বল্লে "আর ভাই কি বল্‌ব—আমি একটা ঘোড়া কিনতে চাই—ঘোড়া না হলে আমার গিন্নী আমাকে খেয়েই ফেল্‌বে—আমি যার কাছে কিনতে যাই সেই আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আমি কত খেটে খুটে এই পাঁচ টাকা জমালুম—সবটাই কড়ায় গণ্ডায় দিতে প্রস্তুত তবু কেউ আমার কথায় কান দেয় না। কি করি বল দেখি নাপিত ভায়া?" নাপিত বল্লে "তা ভাবনা কিসের? আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তোমাকে ঘোড়া না দিতে পারি ঘোড়ার ডিম এনে দিচ্ছি—সে ডিম ফুট্‌লে এমন সুন্দর বাচ্ছা হবে যে, যে দেখবে তার তাক লেগে যাবে। তুমি একটু বস আমি এখনি তোমাকে এনে দিচ্ছি।"

কাছেই নাপিতের কুঁড়ে ঘর ছিল সেখানে গিয়ে বেস একটা বড় কুমড়ো বের কর্‌লে, তার উপর ভাল করে চুন মাখিয়ে ধোপার কাছে এনে হাজির, "এই দেখ ভাই তোমার

জন্য ডিম এনেছি। এর দাম অনেক, কিন্তু বন্ধুতার খাতিরে তোমাকে সস্তা দিচ্ছি, আমাকে এই ৫ টাকা দিলেই হবে। এটা ৭, ৮ দিন রদ্দরে রাখ্‌তে হবে তারপর ফুট্‌লে

এর থেকে এমন ঘোড়ার বাচ্ছা বেরবে যে তুমি তখনি তার উপর চড়ে দৌড়ে ব্যাড়াতে পারবে।" এই বলে হাবুর কাছ থেকে পঞ্চমুদ্রা নিয়ে পিট্টান দিলে।

হাবু ত· ভারী খুসী, সে তখুনি ডিম মাথায় করে নিয়ে চল্‌লো। যেতে যেতে তার মনে নানান্ খেয়াল উঠতে লাগ্‌ল—কেমন সুন্দর বাচ্ছা হবে—যখন বড় হয়ে তার উপর চড়ে ব্যাড়াব আর যখন টক্ টক্ করে গিন্নীর সাম্‌নে দিয়ে চড়ে যাব, তাকে দেখে অবাক্ হয়ে যাবে। আর আমাকে খোটা দিতে পারবে না। বল্‌তে বল্‌তে সে সত্যই এমন দ্রুতবেগে ছুট্‌ল যে ডিমটা মাথা থেকে পড়ে ছরকুটে গেল।

সেই সময় কাছ থেকে একটা শেয়াল যাচ্ছিল। তাকে দেখে হাবু ভাব্‌লে "এই বুঝি বাচ্ছা বেরিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে"—এই ভেবে তার পিছনে পিছনে ছুট্‌ল, এই ধরে আর কি। যখন ধর ধর হল তখন শেয়ালটা দুই পায়ের মধ্যে ল্যাজ গুটিয়ে দে ছুট। তাকে হাবু আর ধর্‌তে পারলে না। কাজেই খালী হাতে ঘরে ফিরে যেতে হল। মাথা হেট করে গিন্নীর কাছে গিয়ে উপস্থিত। বৃত্তান্তটা শুনে গিন্নী জ্বলে পুড়ে মরেন আর কি। "এ

বুঝি তোমার ঘোড়া। ধিক্ তোমাকে! টাকা যা কিছু কষ্টে স্বষ্টে জমিয়েছিলে তাও জলে ঢেলে এলে। আমাদের এ মাস্‌টা চালানো ভার। হাবার গাধাই সাজে—ঘোড়া কিন্‌তে যাওয়া তার পক্ষে বামনের চাঁদে হাত বাড়াবার মতন। আমি আগেই জানতুম তুমি হাজার মাথা খুঁড়লে ও তার কোন ফল হবে না।”

এদিকে শেয়াল ঊর্দ্ধঃশ্বাসে দৌড়ে তার বাড়ী পৌঁছল আর পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ধোপার কথা রাষ্ট্র করে দিলে। শেয়ালদের এক খণ্ড সভা বস্‌ল। পরে অনেক মন্ত্রণার পর শেয়ালের যুক্তিতে যা স্থির হল সভাপতি বলে দিলেন।

প্রথমে এই, যে দিনের বেলায় বেরতে হলে শেয়ালদের ন্যাজ গুটিয়ে ব্যাড়াতে হবে।

দ্বিতীয় এই, যে সকাল সন্ধ্যা যে যত পার চেঁচিয়ে ডাক ছাড়্‌বে আর যখনি হোক্ এক জনের ডাক শুন্‌লে দশজনে তাতে যোগ দিয়ে সকলকে সাবধান করে দেবে। এই নিয়মে না চল্‌লে ধোপার হাতে কোন দিন তোমাদের প্রাণটা খোওয়াতে হবে তা বলা যায় না। সেই অবধি শেয়ালদের মধ্যে এই নিয়মগুলি চলিত হয়ে গেল।

ধোপা যদিও আপনার ঘরে গিন্নীর কাছে অপদস্থ কিন্তু শেয়াল মহলে তার খুব মান, তার নামে সকলেই সশঙ্কিত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

“সন্দেশ”

“সন্দেশ” এসেছে ঘরে থালা নিয়ে আয়,
খোকা খুকী দাদা দিদি আয়রে ত্বরায়।
এ “সন্দেশ” টপ্ করে মুখে পুরে দিলে,
খাইলে পাবিনে রস একেবারে গিলে।
মার কাছে ভাইবোন সকলে বসিয়া
ধীরে সুস্থে মিষ্টরস লইবে চুষিয়া।
খাজা গজা রসগোল্লা “আবার খাবার,”
বাজারেও মিলিবে না এমন আবার।
এ “সন্দেশ” এক মাসে দুই আনা দরে
কেমন সুলভ মূল্যে পাবে বসে ঘরে।

খেয়ে দেয়ে সুধারসে পরিপুষ্ট হয়ে
"সন্দেশের" গুণগাবে সকলে মিলিয়ে।
দেড় টাকা বায়নাত দেও শিশু ভাই
আগে ভাগে যদি এই "সন্দেশ"টী চাই।
একটী বরষ ভরে ঘরে ঘরে পাবে,
ইহার মিষ্টিত্ব কভু নাহি ফুরাইবে।
এসো সবে খুসি মনে, "সন্দেশে"র থালি
মাথায় করিয়া লই থাল করি খালি।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

—*—

ফুল পরী।

আমি কখনো পরী দেখিনি। তোমরা কি কেউ দেখেছ?

পরী আবার কোত্থেকে দেখ্‌ব? পরী কি আছে?

আগের লোকেরা বল্‌ত, 'পরীরা তাদের ছোট্ট ছোট্ট ডানা মেলে চাঁদের আলো বেয়ে আসে, ফুলের ভিতরে ঢুকে লুকোচুরি খেলে, আর ব্যাঙের ছাতার তলায় হাত ধরাধরি করে নাচে, আর জোনাকী পোকার গর্ত্তে ছোট্ট খোকা খুকীদের ঘরে এসে উঁকি মারে।

নীল সাগরের মাঝখানে কাঁকর মাটির দেশ আছে। সেইখানে কালো কালো মানুষ থাকে, তাদের কোঁকরা কোঁকরা চুল। তারা বলে, ফুল পরী তাদের দেশে থাক্‌ত। সে তার সোণার আঁচল দিয়ে ফুলদের গাল টিপে দিত; ভোর বেলার লাল আলো দিয়ে তাদের স্নান করাত; আর ফুরফুরে হাওয়ায় হিমের জল মিশিয়ে তাদের খেতে দিত। ফুলেরা তাকে দেখ্‌তে পেলেই মুখ তুলে হাস্‌ত, আর সে কাছে না থাক্‌লে মাথা হেট করে থাক্‌ত।

সেটা কিন্তু ফুলপরীর দেশ ছিল না; তার দেশ ছিল স্বর্গে। সেইখান থেকে সে ফুল নিয়ে এসেছিল।

তার পর একদিন সে তার দেশে চলে গেল। তখন তাকে না দেখ্‌তে পেয়ে ফুলেরা মাথা হেট করে চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌ল্‌। আর তারা মুখ তুলে চাইল না। তারা শুকিয়ে গেল, শেষে ঝরে পড়ে গেল।

ফুলপরী।

PRINTED BY U. RAY & SONS.

তার পর আর সে দেশের গাছপালায় ফুল হয় না। সে দেশের লোকের তাতে বড় দুঃখ হল। তারা বল্ল, "হায়, ফুল নাই, আমরা কেমন করে থাক্‌ব!"

তাদের মধ্যে ছয় জন বুড়া মানুষ ছিল, তাদের চুল দাড়ি ধব্‌ধবে শাদা। তারা বড় ভাল ছিল, আর তাদের খুব বুদ্ধি ছিল।

তারা বল্ল, "ফুল থাক্‌বে না, তা ও কি হয়। আমরা যাব সেই স্বর্গে, যেখানে ফুল পরীর দেশ। গিয়ে তাকে গড় করব, হাত যোড় করব, ফুল চেয়ে নিয়ে আস্‌ব।"

বলে, তারা মাঠের পর বন, বনের পর মাঠ পার হয়ে, ছজনায় মিলে যেতে লাগ্‌ল। যেতে যেতে তারা সকল দেশের শেষে সেই শাদা পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠ্‌ল, যেখানে পরীদের দেশ।

পরীরা তাদের দেখে বল্ল, "কালো কালো মুখ শাদা শাদা চুল! বুড়া মানুষ, তোমরা কোত্থেকে এসেছ! তোমরা কি চাও?"

তারা হাত যোড় করে বল্ল, 'আমরা স্বর্গে যাব, ফুলপরীর কাছ থেকে ফুল আন্‌তে।"

পরীরা তাতে ভারি খুসী হয়ে বল্ল, "ফুল আনতে যাবে? বেশ, বেশ! এই আমরা তোমাদের পথ করে দিচ্ছি।"

বলে তারা তাদের ছোট্ট ছোট্ট হাতে করে জল নিয়ে সূর্য্যের মুখে ছড়িয়ে দিতে লাগ্‌ল, আর যার পর নাই সুন্দর একটি রামধনুক হল। সেই রামধনুক সেই পাহাড় থেকে গিয়ে একেবারে স্বর্গের সোণার দরজায় ঠেক্‌ল। তখন পরীরা বল্ল, "এর উপর দিয়ে যাও, ফুল পরীর দেখা পাবে।"

তখন সে ছয় জন বুড়া মানুষ সেই রাম ধনুক বেয়ে স্বর্গে চলে গেল। সেখানে গিয়ে তারা ফুলপরীকে প্রণাম করে, যোড় হাতে বল্ল, "মা! তুমি চলে এলে, তাই আর আমাদের দেশে ফুল ফোটে না। তাতে আমাদের দিন বড় দুঃখে যায়।"

শুনে ফুল পরীর চক্ষে জল এল। সে বল্ল, "আহা! বাছা তোদের আর দুঃখ কর্‌তে হবে না। এই দেখ্‌ আমাদের দেশে কত ফুল; তোদের যত ইচ্ছা নিয়ে যা; এখন থেকে তোদের ফুলের দুঃখ দূর হয়ে যাবে।"

ছ জন বুড়া মানুষ তা শুনে বার বার ফুল পরীর পায়ের ধূলা নিল। তার পর তারা ছ জনে যত বয়ে আন্‌তে পারে, তত ফুল নিয়ে তারা দেশে ফিরে এল।

তার পর থেকে সে দেশের গাছে গাছে ফুল ফুট্‌তে লাগ্‌ল, পাহাড় বন মাঠ সব ফুলে ছেয়ে গেল, আর লোকের ফুলের দুঃখ রইল না।

খেলা।

কত রকমের খেলা আছে, তাহা আমি গণিয়া দেখি নাই, তাহার সকলটার নাম ও শুনি নাই, আর তাহার জন্য আমার মাথা ঘুরাইবারও দরকার নাই। আমি কেবল এই কথাটাই বলিতে চাই যে খেলা করিতে বড়ই ভাল লাগে; বিশেষতঃ যদি সে খেলায় একটা কিছু দিয়া আর একটা কিছুকে খুব করিয়া ঠুকিবার সুবিধা থাকে।

এই কাজটার ভিতরে যে খুবই একটা মজা আছে, একথা আমাদের জন্মের ঢের পূর্ব্বেই লোকে বুঝিয়াছিল। একটা কোন রকমের গোলা, সেটাকে হাতে হউক, পায় হউক, লাঠি দিয়া হউক, ডাণ্ডা দিয়া হউক, যে কোন উপায়ে তাড়াইয়া বেড়ান, আর সেই ছুতায় কাহার সঙ্গে রেসারেসী করা,—এমন আমোদের ব্যাপার আর অতি অল্পই আছে। তাই সকল দেশে সকল সময়ের লোককেই এই রকম কোন একটা খেলা খেলিতে দেখা যায়। সেই প্রাচীন কা যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনের মত মহাপুরুষেরাও যে এই খেলা খেলিতেন, এ কথা মহাভারতে স্প লেখা আছে। সে খেলার কায়দা কানুন কি রকমের ছিল, তাহা আমি জানি না; কেবল মাত্র বলিতে পারি যে তাহাদের গোলাটি ছিল লোহার। সেই গোলাটি তাঁহারা বেশ ভা মতেই খাটাইয়া লইতেন। খেলিতে খেলিতে সেটা মাঝে মাঝে তাঁহাদের হাত ছাড়া হ যাইত। একবার সেটা কুয়ায় পড়িয়া গিয়াছিল, সেই কূয়ার ভিতর হইতে আর তাঁহারা নি তাহাকে তুলিতে পারেন নাই।

সে কালের লোকেরাও গোলা লইয়া খেলা করিত, আর এখন তোমরা ও গোলা ল খেলা কর। এখনকার এই খেলাগুলি সবই বিলাতী। ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দে লোকে এ সব খেলার কথা জানিত না, তাহারা খেলিত ডাণ্ডাগুলি। তখনকার গুলিটি কাঠের। উহা যে খুব গোল ছিল, এমন কথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সেকালের তাহাতেই বেশ আমোদ পাইত।

ক্রমে ক্রিকেট দেখা দিল। তখন তাহার নাম ছিল "ব্যাটস্বল" বা "ব্যাটবল"। ব্যাট ঘরেই দেবদারু বা আমকাঠ দিয়া তয়ের করা হইত; বলটি হইত ন্যাকড়ার! উহাও যে সময়েই ঠিক গোল হইত তাহা নহে, তবে উহার একটী চমৎকার গুণ এই ছিল যে, খে খেলিতে উহা থপাস্ করিয়া নাকে লাগিলেও বিশেষ কিছু হইত না। যাহাদের বাড়ীর রবারের গাছ ছিল, তাহারা অনেক সময় সেই গাছের আঠা দিয়া বল তৈরী করিয়া ল সে বলকে একবার মারিতে পারিলে সে কচুরীর মতন চ্যাপ্টা হইয়া পলকের মধ্যে মাঠ হইয়া যাইত।

সেই একদিন গিয়াছে। এখনকার তুলনায় তখনকার খেলার আমোদ নিতান্ত

মানুষী ধরণের ছিল, কিন্তু সেই ছেলে মানুষী খেলাতেই আমরা আমাদের শিক্ষক মহাশয়দের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইতাম।

শীতকালে মেঘলাদিন হইলে, সে দিন ত ছুটী ধরা কথা। একখানি স্লেটে দরখাস্ত লিখিয়া মাষ্টার মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি হাসিয়া বলিতেন "যাও!" সে কথাটি ভাল করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবারও অবসর পাইত না; তাহার পূর্ব্বেই আমরা মাঠে গিয়া হাজির হইতাম।

যাহা হউক, ওরূপ খেলায় আর এখনকার দিনে কাজ চলে না। খোলা মাঠে ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করাতে আমোদ আছে, শরীরের উপকারও আছে। ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি খেলায় সেরূপ আমোদ আর উপকারের কিছুমাত্র অভাব নাই, আর কেবল এই জন্যই যদি কেহ ক্রিকেট ফুটবল খেলিতে যায়, তাহাও দোষের কথা হইবে না। কিন্তু এইরূপ উপকারের চেয়েও উঁচুদরের উপকার এই সকল খেলা হইতে পাওয়া যায়!

খেলিতে হইবে, আর ভাল করিয়া খেলিতে হইবে, নিজের দলের মান যাহাতে বজায় থাকে। এসব খেলায় ভাল হওয়া, বোকা, ভীতু, অলস, অসৎ মতলবী বা অবাধ্য লোকের কর্ম্ম নয়।

বোকা যে সেত ভাল করিয়া খেলা শিখিতেই পারিবে না। ক্রিকেট, ফুটবল, ইহার এক একটি খেলা যেন এক একটি নূতন বিদ্যা। এত রকমের হিসাব এত রকমের কায়দা ইহাতে খাটে যে তাহা শিখিয়া উঠা বোকা লোকের কাজ নয়।

আর যে ভয় পায় সেও বল আসিলে চোখ বুঁজিয়া বসিবে। মুস্কিলের সময়, যখন মাথাটা খুব ঠিক রাখা দরকার,—ঠিক তখনই সে থতমত খাইবে। সুতরাং খেলার সময় তাকে বাদ দিতে হয়।

অলস হইলে খাটিতে চাহিবে না, আর অসতর্ক হইলে কাজের সময় সে দিকে তাহার খেয়াল থাকিবে না। এরূপ লোক দিয়াও কাজের আশা কম। এই ধরণের একটি লোক এতই চটপটে ছিল যে, সে একবার বল ধরিতে গিয়া একটা পাখী ধরিয়া ফেলিয়াছিল। পাখী উড়িয়া যাইতেছে, তাহাকে খপ্ করিয়া ধরা কম ক্ষমতার কথা নহে। কিন্তু এই ক্ষমতার কি কাজ দেখিলে? পাখী ধরিয়া ত আর খেলার কোন সুবিধা হয় নাই; তাহার চেয়ে বলটা ধরিতে পারিলে ভাল ছিল।

স্বার্থপর লোকের কথা আর কি বলিব? ইহারা নিজের সুবিধা করিতে গিয়া সাথীকে বিপদে ফেলে, নিজে বাহবা লইবার লোভে আসল খেলাটাকে মাটি করে। এ সকল খেলায় নিজের আমোদ বা বাহাদুরীর কথা ভুলিয়া গিয়া দলের মান রাখিবার দিকে বিশেষ করিয়া নজর রাখিতে হয়। মতলবী লোকের পক্ষে সেটি করা বড়ই কঠিন।

ইহার চেয়েও অধম, যে অবাধ্য। দলের একজন সর্দ্দার থাকে, তাহার কথা মানিয়া আর

সকলকে চলিতে হয়। সকলেই যদি নিজের নিজের পছন্দ বা সুবিধা মত চলিতে যায়, তাহা হইলে সে খেলা আর গুছাইয়া রাখা কিছুতেই সম্ভব হয় না। কাজেই একজন পাকালোক চাই, যে সকল দিকে নজর রাখিবে, আর সকলকে চালাইবে ইহার কথায় যদি কেহ অবাধ্য হয়, সে নিতান্তই বেখাপ্পা লোক।

খেলিতে আসিয়া ত কেবল কিছুকাল হৈ চৈ করিলে চলিবে না, জিতিয়া যাইতে হইবে; অন্ততঃ যথাসাধ্য তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এইটিই হইল খেলার আসল কথা। খেলওয়াড়দের আর যত রকম দোষ থাকুক, এইটুকু তাহারা সকলেই খুব করিয়া চায়, আর ইহার জন্য নিজের নিজের দোষ শোধরাইয়া লইতে চেষ্টাও করে। ইহাই এই সকল খেলার বিশেষ গুণ।

দশজনে মিলিয়া কাজ করা, নিজকে সামলাইয়া চলা, আপন সুখ ভুলিয়া দশের জন্য খাটা, উপরওয়ালার হুকুম মানিয়া চলা,—খেলার সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিষয়ের অভ্যাস হয়। এটা কিছু নিতান্ত ছোট খাটো কথা হইল না। বড় হইয়া যখন সংসারের কাজে হাত দিতে হইবে, এ সব গুণ তখন ভারি উপকারে আসিবে। ক্রিকেট ফুটবল এ সব ইংরাজদের অতি আদরের খেলা আর ঐ সকল গুণও তাঁহাদের মধ্যে খুব দেখা যায়। লোকে বলে যে, বড় হইয়া যে যেমন হইবে খেলার মাঠেই তাহার গোড়া পত্তন হয়।

ইহা ছাড়া গায়ে বল হয়, নজর ঠিক হয়, হিসাব দোরস্ত হয়, সাহস বাড়ে, আলস্য কমে, সতর্কতা শিক্ষা হয়, এগুলিও কম গুণ নহে। সুতরাং এই সকল খেলার চল যত বেশী হয়, তত ভাল। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। এই যে অন্যকে হারাইয়া নিজে জিতিবার চেষ্টা ইহার একটা বিপদ আছে। সাবধান না হইলে ইহা হইতেই মনে হিংসা আসিতে পারে। যদি তাহা যদি হয়, তবে খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়াই ভাল; উহাতে আর যতই উপকারই হউক, তার কোন মূল্য নাই। যথার্থ খেলওয়াড় যে, সে যথার্থ ভদ্রলোক। তাহার মনে হিংসার স্থান হইতে পারে না, তাহার নজর ছোট হইতে পারে না, অন্যের সুখ দুঃখ সে ভুলিয়া থাকিতে পারে। বিশেষতঃ অন্যায় কাজ সে কখনই করিতে পারে না। যে তাহা পারে, সে খেলওয়াড়ও ভদ্রলোকও নয়।

—*—

কথাবার্ত্তা—

গতবারে একটি বাবুর খোট্টা চাকরের কথা বলিয়াছিলাম, সে 'সন্দেশ' বলিতে জিনিসের জায়গায় আরেক জিনিস বুঝিয়া বড়ই গোলে পড়িয়াছিল। কথার গোলে সময়ই এইরূপ হাসির কাণ্ড হইতে দেখা যায়। "সন্দেশ" আনিতে গিয়া যেমন এই লোকটির হইয়াছিল, তেমনি আর একটি লোক নাকি "বাম্বায়" চিঠি দিতে গিয়া বড়ই মজা করিয়

তাহার বাবু তাহার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিয়াছেন "বাম্বামে ছোড় দেও।" এখন, বাম্বা তাহারা দুই জিনিসকে বলে। চিঠি ডাকে দিবার যে থাম, সেও বাম্বা, আর রাস্তায় যে জলের কল, সে ও বাম্বা; আর এই শেষ জিনিসটার সঙ্গেই চাকরটির বেশী পরিচয়। সে রাস্তার জলের কলের মুখের কাছে নিয়া চিঠি খানা ছাড়িয়া দিল, আর সেটা মাটীতে পড়িয়া জলের সঙ্গে ভাসিয়া চলিল। চাকরটী তাহাতে ভারি খুসী হইয়া মনে করিল যে, "চিট্‌ঠি ত রওয়ানা হুয়া, অব বাবুকা মকানমে পঁহুছ যায়গা!"

আর একটি বাবুর কথা শুনিয়াছি, তিনি এক দিন তাঁহার কয়েকটি বন্ধুকে সন্ধ্যার পর তাঁহার বাড়ীতে আসিতে বলিয়াছিলেন। বন্ধুরা আসিয়া শুধু মুখে কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবেন? তাই বাবু আপিসে যাইবার সময় তাঁহার চাকরটির হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন, "এক টাকার কাঁচা গোল্লা এনে রাখবে।" সন্ধ্যার পর বন্ধুরা আসিয়াছেন, কথাবার্ত্তা চলিতেছে; এমন সময় বাবু ভাবিলেন, "এই বেলা জলযোগটা হইলে হয়।" তখন তিনি চাকরকে বলিলেন, "তোমাকে যা আন্‌তে দিয়েছিলাম, এনেছ?"

চাকর বলিল, "হাঁ বাবু।"

বাবু বলিলেন, "তবে নিয়ে এস।"

খানিক বাদে চাকরটি অনেক হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি বহিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহা দেখিয়া বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ও কি হে?" চাকর বলিল, "কেন সেই যে আপনি আন্‌তে বলেছিলেন।" বাবুর ত চক্ষু স্থির। তিনি চাহিয়াছিলেন 'কাঁচাগোল্লা' চাকর আনিয়াছে এক টাকার 'কাঁচ কলা'।

আর একটি ছেলেকে এক জায়গা হইতে 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান চাহিয়া আনিতে বলা হয়। সে খানিক বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সেখানে তা নেই!" আমি বলিলাম, "নেই কিরে? নিশ্চয় আছে। তুই কি বলেছিলি?" সে বলিল, "আপনি যা বলেছিলেন, আমি তাই বলেছিলাম।" আমি বলিলাম, "বল্‌ত আমি কি বলেছিলাম।" সে বলিল, "গল্প কল্প হুড়ুক!"

পৃথিবীর নাম কেন যে 'পৃথিবী' বা 'পৃথ্বী হইল, এ বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণ হইতে গতবারে একটি গল্প দেওয়া হইয়াছিল। পৃথিবীর অপর দু একটি নামের সম্বন্ধে ও পুরাণে গল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাণে আছে যে, পৃথিবী প্রথমে জলের নীচে ছিল। তখন তাহার মাটি ছিল পাতলা লেইয়ের মত। মাটি যদি লেইয়ের মতন থাকে, তবেত ইহার পরে জীবজন্তুর সৃষ্টি হইলে তাহাদের থাকিবার বড় কষ্ট হইবে। কাজেই জীব জন্তু সৃষ্টি করিবার আগে পৃথিবীটাকে আর একটু জমাট করিয়া লইবার দরকার হইল। তখন নারায়ণ করিলেন কি, মধু আর কৈটভ নামে দুই

ভয়ঙ্কর দৈত্যকে বধ করিয়া তাহাদের চর্ব্বি পৃথিবীর মাটির সঙ্গে মাখাইয়া লইলেন। তাহাতেই পৃথিবী এখন এমন মজবুত হইয়াছে। এই যে মধুকৈটভের মেদ অর্থাৎ চর্ব্বি মাখান হইয়াছিল, এই জন্যই পৃথিবীর নাম হইয়াছে মেদিনী।

একবার পৃথিবীতে পাপীদের অত্যাচার এত বেশী হইয়াছিল যে, পৃথিবী আর তাহা সহিতে না পারিয়া পাতালে চলিয়া যাইতে থাকে। সেই সময়ে মহামুনি কশ্যপ আসিয়া নিজের উরু দিয়া তাহাকে আটকাইয়া রক্ষা করেন। তাই উহার আর এক নাম 'উর্ব্বী'।

এক সময়ে পৃথিবী এই কশ্যপ মুনিরই ছিল, এ জন্য উহাকে 'কশ্যপী'ও বলা হয়।

তোমরা সকলেই অনেক পালোয়ান দেখেছ। কোন কোন পালোয়ান আজকাল মটরগাড়ি থামিয়ে বাহাদুরি দেখান, কিন্তু পিঁপড়ের গায়ের জোরের কথা যদি শোন তবে এ সব পালোয়ানকে পালোয়ান বলেই মনে হবে না। এই যে ছবি দেওয়া এতে দেখান হয়েছে, একটা পিঁপড়েকে পিছনে ঠ্যাঙে চিম্‌টে দিয়ে ধরে ঝুলান হয়েছে আর পিঁপড়েটা কামড় দিয়ে ধরে একটা টাকাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে। টাকাটা ওজনে পিঁপড়ের পাঁচশ গুণেরও বেশী ভারী! কোন পালোয়ান যদি এক পায়ে ঝুলে দাঁতে কামড়িয়ে এক হাজার মন ভারী জিনিস ঝুলিয়ে রাখ্‌তে পারেন, তা

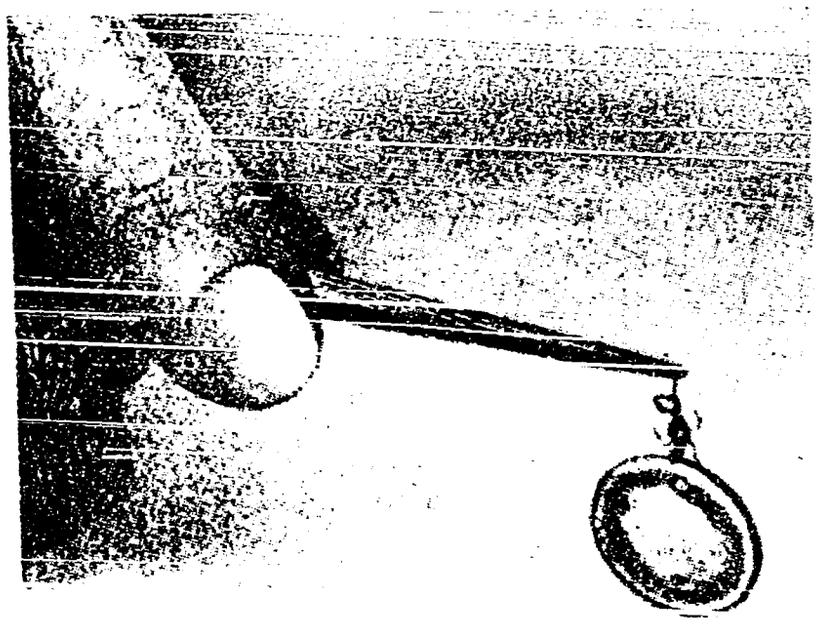

তিনি পিঁপড়ের সমান বাহাদুরি নিতে পার্‌বেন! আর একটা যে ছবি দেওয়া হয়েছে, সেটাতে দেখান হয়েছে একটা পিঁপড়ে একটা রূপোর গাড়ী টেনে নিজের গর্ত্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়ীটা তার চেয়ে প্রায় তের শ' গুণ ভারী! কোন পালোয়ান কি আড়াই হাজার মণ ওজনের একটা গাড়ী টেনে নিতে পারেন? একবার ভেবে দেখ দেখি, পিঁপড়েগুলো যদি মানুষের সমান বড় হ'তো, তবে কি মুস্কিলই হ'তো!

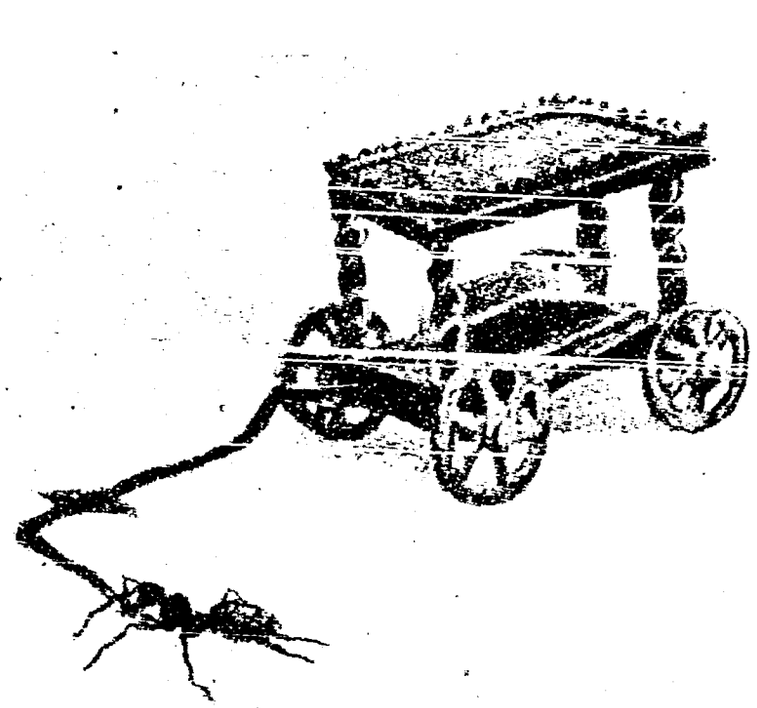

ধাঁধা।

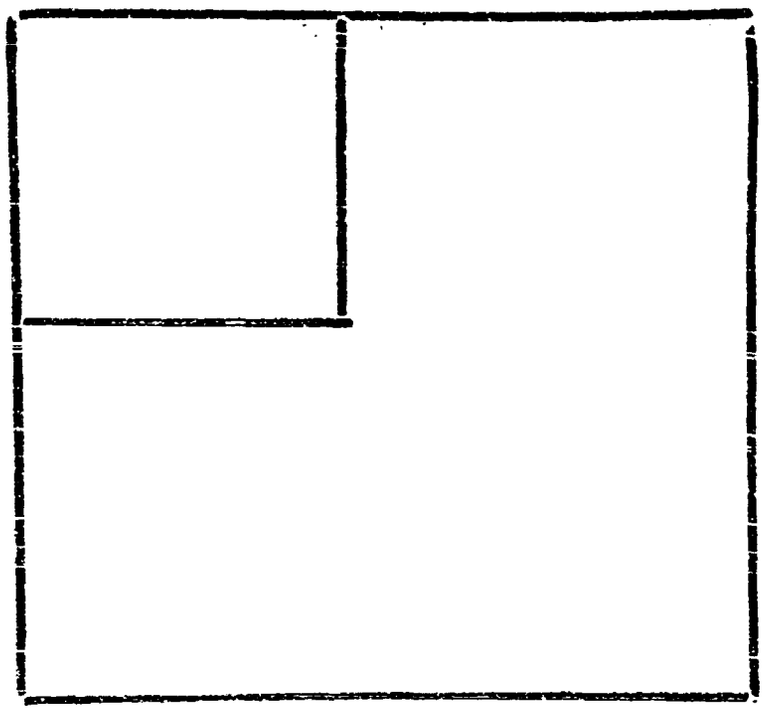

(১)এক চাষার একখণ্ড সমচতুষ্কোণ জমি আছে, তাহার চার ভাগের এক ভাগে সে চাষবাস করে। বাকি জমি সে ঠিক এক মাপের ও এক আকারের চার ভাগে ভাগ করিতে চায়। কিরূপে সে জমি ভাগ করিবে?

(২) একটি বাগানে একটি (মুখ খোলা) পীপের মধ্যে খানিকটা জল ছিল। একজন লোক সেই বাগানের মালীকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আচ্ছা বলতো, পীপেটি ঠিক অর্দ্ধেক ভর্ত্তি কি না?"

মালীর কাছে জল মাপিবার কোন পাত্র অথবা যন্ত্র ছিল না, অথচ সে কোন উপায়ে বলিয়া দিল যে পীপেটি ঠিক অর্দ্ধেক ভর্ত্তি। বলতো, কি উপায়ে সে ইহা ঠিক করিল?

(৩) একটি ঘণ্টাবাজা ঘড়িতে ছয়টা বাজিতে ছয় সেকেণ্ড সময় লাগে। বলতো, ১১টা বাজিতে কত সময় লাগিবে?

—*—

সংবাদ।

রবার্ট মঙ্গার নামক একটি চৌদ্দবছরের ছেলের একটী মাত্র পা। এই এক পায় লাফাইয়াই সে সেদিন আর বিয়াল্লিশ জন লোককে হারাইয়া দিয়াছে। মঙ্গার পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি অবধি লাফাইয়া উঠিয়াছিল।

রাইন নদীর তীরে একটী লোহার স্তম্ভ খাড়া করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। এই স্তম্ভ ১৫০০ ফুট উঁচু হইবে। নদীটি ৩০০ ফুট চওড়া। ইঞ্জিনিয়ারগণ বলেন যে, এই তিন শত ফুট চওড়া নদীর উপরে পাশাপাশি দুটি লোহার পোল তয়ের করিয়া তাহার উপরে স্তম্ভ তুলিলে কাজের ও সুবিধা হইবে, দেখিতে ও ভাল হইবে।

আমেরিকার আদিম অধিবাসী অসভ্যদিগকে 'রেড্ ইণ্ডিয়ান' বলে। ইহারা ভারি মজার

লোক, আর, ইহাদের নাম গুলি বড়ই চমৎকার। একজনের নাম 'লম্বাঘুম', আর একজনের নাম 'শাদা বাছুর', আর এক জনের নাম 'কুঁড়ে ছেলে', আর একজনের নাম 'মস্ত লাউ', আর একজনের নাম 'ওযুদ প্যাঁচা'। বাড়ীঘর বাঁধিয়া থাকার অভ্যাস ইহাদের নাই। ইহারা মাঠে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেই ভালবাসে, ঘরের ভিতরে থাকা পচ্ছন্দ করে না। যাহাদের নাম করিলাম, তাহাদিগকে নিউইয়র্ক নগরে আনিয়া একটা খুব বড় হোটেলে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা ঘরের ভিতরে থাকিতে কিছুতেই রাজি হইল না; তাহারা ভাবিল, 'গর্ত্তের ভিতরে কেন থাকিব?' শেষে তাহারা ছাতে গিয়া বাসা লইল।

ফরাসী দেশীয় এক পণ্ডিত বলেন যে তিনি এক রকমের অতি আশ্চর্য্য গাছ আবিস্কার করিয়াছেন। এই গাছের পাতায় ধূলা পড়িলে পাতাগুলি নাকি খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতে থাকে।

আফ্রিকা দেশে কিবু নামে একটি সুন্দর হ্রদ আছে। এই হ্রদের জলে কোন কোন সময় আপনা হইতেই ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠে। একটুও হাওয়া নাই, ঢেউ উঠিবার কোন কারণই দেখা যায় না, অথচ হ্রদের জল তোলপাড় হইতে থাকে। অনেকে মনে করেন যে এই হ্রদের তলায় আগ্নেয় পর্ব্বত আছে, তাহারই তাড়নায় উহার জলে এরূপ ঢেউ হয়। হ্রদের নিকটে অনেকগুলি আগ্নেয় পর্ব্বত আছে, সে গুলিকে সে দেশের লোকেরা 'মুফুম্বিরো'—অর্থাৎ, আগুণের জায়গা—বলে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে গঙ্গো নামে একটা দৈত্য সেই সকল পর্ব্বতে বাস করে। ইহাদের একটি পর্ব্বতের নাম 'নিনা গঙ্গো', অর্থাৎ গঙ্গোর স্ত্রী। একবার নাকি গঙ্গো রাগ করিয়া তার এই স্ত্রীর মাথাটা কাটিয়া কিবু হ্রদের জলে ফেলিয়া দেয়। আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে আগুন বাহির হইবার সময় মাঝে মাঝে তাহার মাথা উড়িয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং গঙ্গোর স্ত্রীর মাথা কাটার ঘটনা সত্য হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে!

গ্রীস দেশের নিকটে, সমুদ্রের তলায় একটি পুরাতন সহরের চিহ্ন দেখা গিয়াছে। সহরটি এখন ১৫ হইতে ৭৫ ফুট জলের নীচে, তথাপি উহার ভাঙ্গা বাড়ী ঘরগুলি জলের উপর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানটি বেশী বড় নয়, উহার বেড় মাইল তিনেক হইবে।

—*—

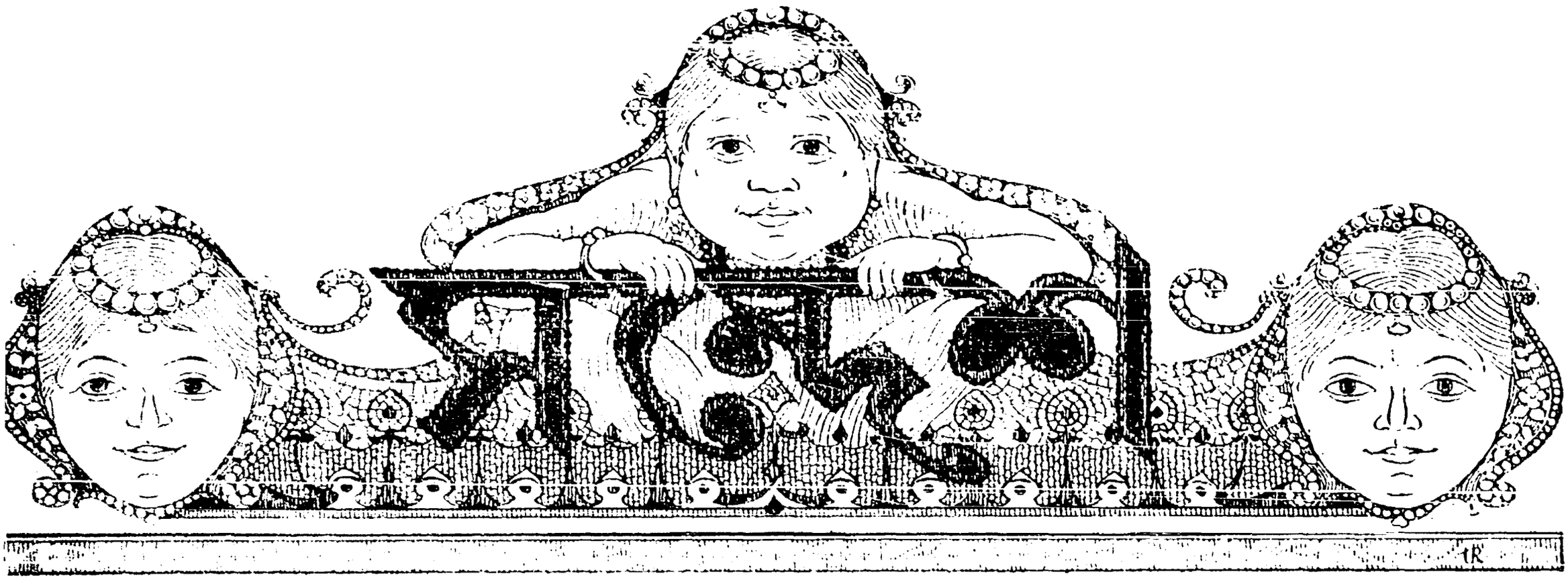

শিশুর জাগরণ।

আইল নামি বিমল উষা
উঠিল আলো খেলি,
তরুর কোলে পুলকে ফুল
হাসিল আঁখি মেলি।

বহিল ধীরে শীতল বায়
গাহিল পাখী বনে,
খোকনমণি ঘুমায় ঘরে
ভাবনা নাহি মনে।

জানালা দিয়ে সোণার আলো
চুমিল তারে আসি,
নয়ন মেলি মায়ের পানে
চাহিল খোকা হাসি।

—*—

ত্রিপুর।

দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক শত্রুতা ছিল। দিনরাতই কেবল ইহাদে মারামারি চলিত, তাহাতে অনেক সময় অসুরেরাও হারিত, অনেক সময় দেবতারা হারিতেন। দেবতারা অসুরদের জ্বালায় অস্থির থাকিতেন, আবার অসুরেরা তপস্যা করি তাহাদিগকে বর না দিয়াও পারিতেন না। বর দিয়া তারপর তাহার ধাক্কা সামলাই তাঁহাদের প্রাণান্ত হইত।

একটা অসুর ছিল, তাহার নাম ময়। যাদু, মায়া, ভেল্কীবাজী যত আছে, তাহার সকলই জানিত, আর তাহার জোরে সময় সময় দেবতাদিগকে ভারি নাকাল করিত

একবার যুদ্ধে হারিয়া ময় তপস্যা করিতে লাগিল। বিদ্যুন্মালী আর তার নামে আর দুইটা অসুরও তাহার দেখাদেখি তপস্যা আরম্ভ করিল। তাহারা উপব করিয়া, শীতে ভুগিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, এমনি আশ্চর্য্য তপস্যা করিল যে, ব্রহ্মা আর তাহ দের কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ব্রহ্মা বলিলেন, "বাপু সকল, আমি তোমাদের তপস্যায় বড়ই তুষ্ট হইয়াছি এখন, কি বর লইবে বল।"

তখন ময় যোড় হাতে, মিষ্ট কথায় তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিল, "প্রভু! দেবতা আমাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এখন আমরা কোথাও একটু থাকি জায়গা পাইতেছি না। দয়া করিয়া আমাকে এমন বর দিন, যাহাতে আমি একটি ভাল দুর্গ প্রস্তুত করিতে পারি। সে দুর্গের ভিতরে বসিয়া থাকিতে আর কেহই আমাদের কিছু করিতে না পারে।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "একেবারে কেহই কিছু করিতে পারিবে না, এমন কি হয়?"

ময় বলিল, "তাহা যদি না হয়, তবে এই বর দিন, যে একমাত্র শিব ছাড়া আ কেহ সে দুর্গ নষ্ট করিতে পারিবে না; আর শিবকেও একটি মাত্র বাণ মারি সে কাজ করিতে হইবে।"

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন, ময়ও যার পর নাই খুসী হইয়া দুর্গ প্র করিতে লাগিল।

ময় বলিল, "আমি এমন দুর্গ বানাইব যে, তাহা তিন ভাগ হইয়া তিন জায়গ

থাকিবে। তাহা হইলে আর এক বাণে তাহাকে নষ্ট করা যাইবে না। খালি, এক-দিন সেই তিনটি ভাগ একত্র হইবে,—যে দিন চন্দ্র আর সূর্য্য এক সঙ্গে পুষ্য নক্ষত্রে থাকিবেন। সেই দিন যদি শিব আসিয়া বাণ মারেন, তবেই আমার এই দুর্গ তিনি নষ্ট করিতে পারিবেন, নহিলে নয়।”

এমনি করিয়াই সে তাহার সেই দুর্গ প্রস্তুত করিল। পৃথিবীর উপরে করিল একটা লোহার দুর্গ; সেটা তারকের জন্য। স্বর্গে করিল একটা রূপার দুর্গ; সেটা বিদ্যুন্মালীর জন্য। আর স্বর্গেরও উপরে একটা সোণার দুর্গ, সেটা করিল তাহার নিজের থাকিবার জন্য। এইরূপে তিনটি পুরী মিলিয়া দুর্গটি প্রস্তুত হইল, তাই তাহার নাম হইল ত্রিপুর।

তেমন দুর্গ আর কেহ কখনও দেখে নাই। যেমন বড়, তেমনি মজবুত, তেমনি সুন্দর। মাঠ, বাগান, পথ ঘাট, হাট বাজার, নদী পুকুর, সকলই তাহার ভিতরে আছে, কোন জিনিসের জন্যই দুর্গের বাহিরে যাইতে হয় না। অসুরেরা যে যেখানে ছিল, খবর পাইয়া সকলে আসিয়া সেই দুর্গে বাস করিতে লাগিল। তাহাদের আর আনন্দের সীমা নাই; আর তাহাদের কিসের ভয়?

তখন তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল। এতদিন দেবতাদের ভয়ে ঝোপে জঙ্গলে লুকাইয়া ছিল, এখন আবার সুবিধা পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে খোঁচাখুঁচি আরম্ভ করিল। কোন দিন স্বর্গের বাগান ভাঙ্গে, কোন দিন দেবতাদের বাড়ীতে গিয়া ঝগড়া করে, কোন দিন মুনি ঋষিদিগের তপস্যা মাটি করিয়া দেয়।

ময় নিজে তেমন মন্দ লোক ছিল না কিন্তু অসুরেরা তাহার কথা শুনিলে ত। তাহারা দল বাঁধিয়া সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাহাকে পায়, তাহাকেই ধরিয়া মারে; তাহাদের ভয়ে লোকে স্থির হইয়া ঘরে থাকিতে পারে না।

তখন সকলে ব্রহ্মার নিকট গিয়া যোড় হাতে বলিল, “হে পিতামহ! আপনি ত অসুরদিগকে বর দিয়াছেন, এখন আমাদের কি উপায় হইবে? অসুরের জ্বালায় আমা-দের প্রাণে বাঁচাই যে ভার হইয়াছে। আপনি যদি ইহাদের শাসন না করেন, তবে আর সংসারে দেবতা মানুষ বা জীব জন্তু কিছুই থাকিবে না!”

ব্রহ্মা বলিলেন, “তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি বর দিয়াছি বটে, কিন্তু উপায়ও রাখিয়া দিয়াছি। উহাদের ঐ দুর্গ একটি বাণেই ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়; কিন্তু তাহা তোমরা পারিবে না। চল শিবের কাছে যাই, তিনিই এ কাজের উপযুক্ত লোক।”

শিব তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় তেত্রিশ কোটি দেবতা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া যোড় হাতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

শিব বলিলেন, "তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? বল, আমি তোমাদের কি উপকার করিতে পারি; এখনি তাহা করিব।"

দেবতারা বলিলেন, "অসুরেরা ত আর আমাদের কিছু রাখিল না, এখন আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমাদের বাড়ী বাগান সব ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, হাতী ঘোড়া ধরিয়া নিয়াছে, ধন রত্ন লুট করিয়াছে, এর পর প্রাণে মারিবে। দোহাই ঠাকুর! আমাদিগকে রক্ষা করুন!"

তাহা শুনিয়া শিব বলিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি ত্রিপুর দুর্গ পোড়াইয়া দিতেছি। একখানা ভাল রকম রথ আন ত।"

একথায় দেবতারা সকলে মিলিয়া, সংসারের সকল ভয়ঙ্কর আর আশ্চর্য্য জিনিস দিয়া, এমনি চমৎকার এক রথ প্রস্তুত করিলেন যে কি বলিব! রথের দিকে চাহিয়া শিব অনেক ক্ষণ ধরিয়া খালি 'বাঃ!' 'বাঃ!" এইরূপই করিতে লাগিলেন। তার পর তিনি বলিলেন, "বেশ রথ হইয়াছে! এখন ইহার উপযুক্ত একটি সারথি চাই।"

দেবতারা ত বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন। এমন রথের সারথি ত যেমন তেমন হইলে চলিবে না,—হায়! এখন সারথি কোথায় পাই?

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "চিন্তা কি? আমিই সারথি হইব।"

এই বলিয়া ব্রহ্মা যখন রথে উঠিয়া রাশ ধরিয়া বসিলেন, তখন সকলের কি আনন্দই হইল! শিবও তখন যার পর নাই সুখী হইয়া বলিলেন, "এইবার ঠিক সরথি হইয়াছে!"

সেই রথে চড়িয়া শিব যুদ্ধ করিতে চলিলেন; সঙ্গে দেবতা গন্ধর্ব্ব সকলে জয় জয় শব্দে ছুটিয়া চলিল। ষাঁড়ে চড়িয়া নন্দী চলিল, ময়ূরে চড়িয়া কার্ত্তিক চলিলেন, ঐরাবতে চড়িয়া ইন্দ্র চলিলেন, সাপে চড়িয়া বরুণ চলিলেন, মহিষে চড়িয়া যম চলিলেন। শিবের যত ভূত, তাহারাও শিবের রথ গিরিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে চলিল; হাতীর মত, পাহাড়ের মত তাহাদের শরীর, মেঘের মত তাহাদের ডাক।

এ দিকে অসুরেরা এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ময় তাড়াতাড়ি অসুরদিগকে ডাকিয়া বলিল, "সাবধান, সাবধান! ঐ দেখ দেবতারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে! দেখিয়ো, যেন উহাদিগকে সহজে ছাড়িয়ো না।"

এমনি করিয়া ক্রমে দেবতা আর অসুরদিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুর-

গুলি দেখিতে যেমন ভয়ঙ্কর, শিবের ভূত সকলও তেমনি বিকট ; আর তাহাদের যুদ্ধও হইল বড়ই সাঙ্ঘাতিক। অসুরেরা মনে করে যে তাহারা দেখিতে ভারি সুন্দর, তাই ভূতগুলির জানোয়ারের মত মুখ দেখিয়া, তাহারা আর হাসি রাখিতে পারে না। সেই ভূতদের সঙ্গে খানিক যুদ্ধ করিলেই আবার তাহাদের সে হাসি শুকাইয়া যায়। তবুও অসুরেরা যেমন তেমন যুদ্ধ করে নাই। ময় আর তারক দুজনে নানারূপ মায়া খেলাইয়া ভূত আর দেবতা সকলকেই যার পর নাই ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কোথা হইতে যে তাহারা যত রাজ্যের আগুন, আর বৃষ্টি, আর ঝড়, আর বাঘ, আর সাপ, আর কুমীর আনিয়া দেবতাদের উপর ফেলিতে লাগিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। তথাপি ক্রমে দেবতাদেরই জয় হইতে লাগিল, নন্দীর হাতে বিদ্যুন্মালী মারা গেল, আর সকল অসুরই কাবু হইয়া পড়িল। তখন ময় দেখিল যে এখন একবার দুর্গের ভিতরে গিয়া একটু বিশ্রাম না করিলে আর চলিতেছে না।

দুর্গের ভিতরে আসিয়া ময় ভাবিতেছে, এখন উপায় কি হয়? এমন দুর্গ করিয়াও দেবতাদের হাতে শেষে এত নাকাল হইতে হইল! বলিতে বলিতেই চট্ করিয়া তাহার মাথায় বুদ্ধি যোগাইয়াছে, আর অমনি সে মায়ার বলে দুর্গের ভিতরে এক আশ্চর্য্য পুকুর তয়ের করিয়া ফেলিয়াছে। সে পুকুরের জল অমৃত, সে জল একবার খাইলে বা তাহাতে স্নান করিলে মরা যে সেও বাঁচিয়া উঠে।

তখন আর কিসের ভয়? যত অসুর মরে, সকলকেই আনিয়া সেই পুকুরে স্নান করায়। এমনি করিয়া তাহারা বিদ্যুন্মালীকে আবার বাঁচাইয়া তুলিল, আর কত মরা অসুর যে বাঁচাইল তাহার ত লেখা জোখাই নাই। বাঁচিয়া উঠিয়াই তাহারা আবার বলিল, "কোথায় গেল শিব? কোথায় নন্দী? কোথায় দেবতা? কোথায় ভূত? মার তাহাদের সকলকে!"

এবারে দেবতারা বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন। যত অসুর মারেন, সকলেই খানিক পরে আবার আসিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে। এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মরিয়াও মরে না, বরং তাহাদের গায়ের জোর যেন আরো বাড়িয়া যায়। দেবতাগণ আর ভাবিয়া পথ পাইতেছেন না।

এমন সময় শিবের একটা ভূত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, অসুর মারিয়া আর কি হইবে? এদের ঘরে পুকুর আছে, তাহার জলে ছোপাইলে মরাটি চাঙ্গা হয়!"

অসুরেরা তখন বড়ই ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছিল। দেবতারা একে ইহাদের জ্বালায় অস্থির, তাহাতে আবার শিবের রথের চাকা মাটিতে বসিয়া গিয়াছে, সকলে প্রাণপণে টানাটানি

করিয়াও তাহাকে তুলিতে পারিতেছেন না। তখন যদি বিষ্ণু তাড়াতাড়ি এক বিশাল ষাঁড় সাজিয়া শিং দিয়া সেই রথ না উঠাইতেন, তবে না জানি সে দিন কি সর্ব্বনাশই হইত। ইহারই মধ্যে তারকাসুর ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে এমনি গুঁতা মারিয়াছিল যে, তিনি হাতের রাশ রথে ফেলিয়া কেবলই হাঁপাইতেছিলেন।

এদিকে বিষ্ণু রথখানিকে শিং দিয়া উঠাইয়া দিয়াই অসুরদিগের দুর্গের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। অসুরেরা তাঁহার বিশাল দেহ আর শিং নাড়া দেখিয়া আর গর্জ্জন শুনিয়া, আর তাঁহাকে আটকাইতে সাহসই পাইল না। তিনি ছুটিতে ছুটিতে সেই পুকুরে গিয়া চোঁ চোঁ শব্দে তাহার সমস্ত জল খাইয়া ফেলিলেন।

ইহার পর আর অসুরেরা ভূতদের সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠিল না; তাহারা টিপ্ ঢাপ্ ভূতের কীল খাইতে খাইতে ছুটিয়া দুর্গের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সকলে হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কোথায় শিব? কোথায় দেবতা? কোথায় ভূত? মার্ সকলকে!!"

তখন আর অসুরেরা ভূতের ভয়ে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাদের দুর্গ শুদ্ধ সমুদ্রের উপরে চলিয়া গেল। কিন্তু দেবতারা তাহাদিগকে এত সহজে ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সেইখানে গিয়া আবার তাহাদের সঙ্গে বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তারকাসুর নন্দীর হাতে মারা গেল, বিদ্যুন্মালীরও সেই দশা হইতে আর অধিক বিলম্ব হইল না।

তার পর ক্রমে সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন চন্দ্র আর সূর্য্য এক সঙ্গে পুষ্য নক্ষত্রে আসিবেন। সেই পুষ্যযোগে ত্রিপুর দুর্গের তিনটি ভাগও এক জায়গায় আসিয়া মিলিবার কথা। তখন তাহার উপরে শিবের বাণ পড়িলে, এক বাণেই সেই দুর্গ নষ্ট হইয়া যাইবে। শিব তাহার জন্যই ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রস্তুত আছেন। ঠিক সময়টি উপস্থিত হইবামাত্র ভীষণ শব্দে তিনি যেই বাণ ছাড়িয়া দিলেন, অমনি তাহা আকাশ পাতাল আলো করিয়া অসুরদিগের দুর্গের উপর গিয়া পড়িল। সে বাণের তেজ এমনি ছিল যে, দুর্গের উপরে তাহা পড়িবামাত্রই দেখিতে দেখিতে সেই দুর্গ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

এইরূপে ত্রিপুর দুর্গের শেষ হইল। অসুরেরা আর সকলেই তাহার সঙ্গে পুড়িয়া মরিয়াছিল, কেবল ময় মরে নাই। সে শিবের ভক্ত ছিল, তাই শিব দয়া করিয়া নন্দীকে পাঠাইয়া আগেই তাহাকে সাবধান করিয়া দেন। নন্দীর কথায় সে তাহার থাকিবার ঘরখানি শুদ্ধ পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

——*——

আমার ময়ূর।

পাখী কে না ভালবাসে, তাদের গান, তাদের চলাফেরা, সুন্দর ভঙ্গী কার না মন হরণ করে? বিশেষতঃ তাদের যা আছে আমাদের তা নেই; তারা উড়তে পারে—পাখা মেলে দিয়ে আলোর আর বাতাস সাগরে সাঁতার দিতে দিতে কোথায় চলে যায়—আমরা ঘরে বসে বসে দেখি, আমাদের মন উড়ু উড়ু করে, তবু গাছের মত এক জায়গায় পোঁতা হয়ে আমরা আমাদের মনের ডালপালা নেড়েই মরি, চল্‌তে পারিনে। তাই এই আকাশ বাতাসের সঙ্গী, বহু দেশ দেশান্তরের সংবাদ বহদের, আমাদের বড় রহস্যময় মনে হয়; তাদের সব খবর জান্‌তে ইচ্ছে হয়।

খাঁচায় পূরে রাখলে তাদের উপর একটু অত্যাচার হয়, তাই আমি একবার একটি ময়ূর পুষেছিলাম। সেটি যখন প্রথম এল তখন ছোট্ট কচি ময়ূরবাচ্ছা—ময়ূরছানা কি মুরগিছানা বোঝা কঠিন। কথায় বলে, ও যেন একটি ময়ূর ছানা—তার মানে বাচ্ছা বয়সে কুশ্রী, ক্রমে সুন্দর হয়ে ওঠে। এরও তাই হ'ল—প্রথম যখন এল তখন না ছিল তার মাথার উপরে বঙ্কিম চূড়া, না ছিল তার চাঁদের টুকরো দিয়ে সাজান, ছড়ান বিচিত্র পুচ্ছ। গায়ের বর্ণ একেবারে মাটির মত, শুক্‌নো ঘাসের মত।

ভাল করে খেতে পার্‌তনা, তাই তাকে হাতে করে খাইয়ে দিতে হ'ত। নিজের শক্তি নেই, তবু লোভটি পূরোপূরি ছিল—মুখে যতটা ধরে, খাবল দিয়ে তার চেয়ে বেশী মুখে পূরে, তার পর গিল্‌বার সময়ই মুস্কিল। তখন চোখ বুজে, ঘাড় বাঁকিয়ে, অনেক চেষ্টায় সেটি গলাধঃকরণ হ'ত, হবামাত্র আর সে কষ্টের কথা মনে থাক্‌তনা, দ্বিতীয় গ্রাসটি নেবার সময়ও ঠিক্ ঐ ব্যাপার। তোমাদেরও বাপু কারো কারো ঐ দোষ আছে—মুখে যতটা ধরে তার চেয়ে ঢের বেশী ভরে', বিষম খাবার যোগাড় কর; ওটা ভাল অভ্যাস নয়। দিব্যি পেট ভরে খেয়ে কিছুকালের জন্যে সে নড়াচড়া বন্ধ করে এক কোণায় পড়ে থাক্‌ত। চিংড়ি মাছ আর মোটা ভাত খেতেই সে বেশী ভালবাস্‌ত, তার ফল, ধান চালের উপর তেমন আগ্রহ ছিল না।

খাবার যত্নে সে শীগ্‌গিরই বেশ বেড়ে উঠ্‌ল। তখন তার সর্ব্বাঙ্গে রংএর লীলা দেখা দিল—মাথার চূড়াটি বেড়ে উঠে সোনালি সবুজে ভরে উঠ্‌ল, বাতাসে সেটি যখন কাঁপ্‌ত তখন সুন্দর দেখাত। গায়ের মাটীর বর্ণ সোণালি সবুজে নীলে মিশিয়ে যাকে ধূপ ছায়া আর ময়ূরকণ্ঠী রং বলে, তাই হ'ল—একটু নড়াচড়া কর্‌লে নীল বিজুলি

আলোকশিখার মত একটি কিরণ তার গায়ের উপর ঢেউ খেলিয়ে যেত। পুচ্ছটি যেমন বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল, তেম্নি তাতে নীলকান্ত মণির খণ্ড খণ্ড চাঁদ দেখা দিল।

তার চেহারা যেমন চোখ্ ভুলান, ধরণধারণ, গতিভঙ্গী, তেমনি মন ভুলান হল। ভারী দুষ্ট; অতিশয় মিষ্টি। আমি সকালে যখন ভাঁড়ার দিতে,তরকারী কুটতে যেতাম, সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ত। তার বরাদ্দ চাল ধান তার পছন্দ হত না, আমার গোছান জিনিষ ঠুকরে চারিদিকে ছড়িয়ে দিত—দাসীরা যদি তাড়া দিত, তবে উল্টে তাদের তাড়া কর্‌ত। আমি বক্‌লে কিম্বা মারবার ভাণ করলে, দাঁড়িয়ে চোখ মিট মিট করত; হয়ত বা, আরো দুষ্টু হয়ে বেশী করে ছড়িয়ে দিয়ে, পাখা ছড়িয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াত—ভাবখানা যে 'আমায় বুঝি মার্‌বে? মারতে আর হয় না!' মারতে আর হ'ত নাই সত্যি, তার দুষ্টুমিষ্টি ভাব দেখে, তাকে কোলে টেনে নিতে ইচ্ছে করত—আমি শুধু হাস্‌তাম। আহ্লাদ পেয়ে পেয়ে সে আদুরে ছেলের মত আবদেরে হয়ে উঠেছিল—সমস্ত ক্ষণ পায়ে পায়ে ফিরত—কাজ কর্ম্মের সময় তার দিকে মন দিতে না পার্‌লে কাপড় ধরে টানত। আমি যখন বসে বসে লিখ্‌তাম, আমার চৌকীর হাতায় এসে বস্‌ত। তবু যদি তার দিকে না চেয়ে দেখ্‌তাম,তাহলে আমার হাতে ঠোকর দিত,এলো চুলের গুচ্ছ ধরে টান্‌ত—কাজেই অমনোযোগের ভাণ বেশীক্ষণ রক্ষা করা কঠিন হ'ত।

যখন সে ছোট ছিল তখন তাকে রাত্রিবাসের জন্যে একটি বড় ঝুড়ি দিয়ে ঢাকা দিয়ে ঘরের এক পাশে রাখা হত, কিন্তু যত বড় হতে লাগ্‌ল ততই এরকম আটক থাক্‌তে, আপত্তি দেখাতে আরম্ভ কর্‌ল। তখন তাকে ছেড়ে রাখা হত—সন্ধ্যার একটু আগেই ছাদের সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে, ছাদের পাশেই প্রকাণ্ড এক দেবদারু গাছে আশ্রয় নিত। সেখানেই রাত্রিযাপন করত। ভোর হলেই, তার সাড়া পাওয়া যেত, তখন আর সে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আস্‌তনা—পাখা মেলে মহানন্দে উড়ে নেমে আস্‌ত। প্রথমটা খানিকটা বাগানময় ডানা মেলে ছুটোছুটি করে বেড়াত। তারপর প্রাতরাশ সমাধা করে, মাটীর উপর বুক দিয়ে জড় সড় হয়ে রোদ পোয়াতে খুব ভালবাস্‌ত। দিনের মধ্যে খেলা ধূলো লাফালাফি দুষ্টামির মাঝে মাঝে প্রায়ই এমনি নিস্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ থাক্‌ত।

নিজে স্বাধীন ভাবে চলে ফিরে বেড়াত, তাই খাঁচায় পোরা পাখী সে আদপেই দেখ্‌তে ভালবাস্‌তনা। আমার একটি কেনারি, একজোড়া চীনে টিয়া আছে আর একটি ময়না ছিল। ময়নাটি বড় সুন্দর, পাহাড়ী ময়না, সচরাচর ময়নার চেয়ে অনেক বড়—গলার স্বর গম্ভীর,

"অমনোযোগের ভাণ বেশীক্ষণ রক্ষা করা কঠিন হ'ত"।

ENGRAVED AND PRINTED BY
U. RAY & SONS, CALCUTTA.

বেশ স্পষ্ট কথা কইত। আমি তাকে বন্দে মাতরং বল্‌তে শেখাচ্ছিলাম—দু ছত্র শিখে-ছিল। এমন মন দিয়ে শুন্‌ত যে অল্প সময়ের মধ্যেই শিখ্‌তে পারত। এই পাখীটিরে বন্ধ থাকা দেখ্‌তে ময়ূরের মোটেই ভাল লাগ্‌তনা, দু তিনবার তাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল; কৃতকার্য্য হয়নি। পাহারা বড় কড়া ছিল। একদিন দুপুরে সবাই শুয়েছে আমি আমার ঘরে বসে পড়ছি—বারান্দায় একটা খুব ঝটাপটির শব্দ শুন্‌তে পেলাম—আমি মনে করলাম ময়ূরচন্দ্র নৃত্য করছেন, একবার ভাবলাম উঠে দেখি, কিন্তু হাতের বইয়ে মন একেবারে ডুবে ছিল, ওঠা সহজ হ'লনা। কিছুক্ষণ পরে দাসীরা খেয়ে এসে বল্লে "ওমা ময়না কোথায় গেল"—ময়ূর তার খাঁচা খুলে তাকে বিদায় করে দিয়েছে—আকাশের পাখী খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে সেকি আর থাকে, কোথায় উধাও হয়ে গেল—আর ফিরে এলনা।

যতদিন ময়ূর ছোট ছিল, বাড়ীর বাগানে বেড়িয়েই তার মন ভর্‌ত কিন্তু যত বড় হতে লাগ্‌ল ততই চঞ্চলতা দেখা দিলে—বাড়ী ছেড়ে প্রতিবেশীর ওখানে যেত, তারপর মালী গিয়ে তাকে খুঁজে খুঁজে বাড়ী আনত; অগত্যা দিন কত পাখা বেঁধে রেখে দিতে হয়েছিল। বাড়ীতেই থাক্‌ছে দেখে আবার খুলে দিলাম। একদিন ভোরে উঠে ময়ূরের আর দেখা নাই। আমাদের বাড়ীর এক পাশে একটি বসতি আছে, অনেক মুসলমানের বাস—আমি মনে করলাম, তারাই বুঝি ধরে রেখেছে। খোঁজ করে জান্‌লাম, আমার সন্দেহ ভুল, বরং ময়ূর পাওয়া যাচ্ছে না শুনে তারাই চারিদিকে খুঁজতে দৌড়িল। আশা যখন একেবারে ছেড়ে দিয়েছি—বেলা প্রায় ১টা এমন সময় একজন ময়ূর কোলে করে এসে উপস্থিত হল। হারাধন পেয়ে ভারী আনন্দ হয়েছিল কিন্তু একটু পরেই তার অবস্থা দেখে সব আগ্রহ কোথায় চলে গেল। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করার উৎসাহে ময়ূর সেদিন, আমাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকের একটা প্রকাণ্ড পুকুর পার হয়ে, যাদের বাড়ী উঠেছিল তাঁরা জম্মাণ—তাকে ধরে বাক্‌সে পূরবার চেষ্টায় একখানি পা একেবারে ভেঙে দিয়েছেন—আমাদের লোক হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত না হলে, তাকে কাবাব করবার বন্দোবস্ত হচ্ছিল।

কিছুদিন খুবই কষ্ট ভোগ করে একদিন ভোর বেলা তার সব কষ্টের অবসান হল। যত দিন বেঁচে ছিল—প্রতিদিন যখন গরম জল দিয়ে ধুইয়ে ওষুধ বেঁধে দিতাম কোন আপত্তি করতনা, এতযে তার দুষ্টামি সব যেন কোথায় চলে গেল। এমন নরম হয়ে থাক্‌ত দেখ্‌লে বড় কষ্ট হত—যদি বল্‌তাম তোর পা দেখি—অম্নি কাৎহয়ে শুয়ে পা দেখাত।

যখন ময়ূরটা মরে গেল তখন মনে মনে বল্লাম আর পাখা পুষবনা—আজ কিন্তু ভাবছি তেম্নি একটি যদি পাই তবে আবার পুষি।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সময়ের হিসাব।

দিন আর রাত, এই দুইটা জিনিসকে যে দিন চিনিতে পারিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে সময়ের হিসাব রাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। এ কাজটি করিতে যে দিন ভুলিয়া যাইব, সে দিন হইতে আর কোন কাজই আগলাইয়া রাখিতে পারিব না।

শুনিয়াছি, এক রাজা অনেকগুলি অলস পুষিয়াছিলেন, তাহারা সময়ের কোন ধারই ধারিত না, খালি বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইত। কিন্তু এখন আর সে রাজাও নাই, সে দিনও নাই। এখন সংসারে টিকিয়া থাকিতে হইলে সময়ের হিসাব রাখিতে হয়। যদি কাহারও তাহা না করিবার মতলব থাকে, তিনি এই বেলা সাবধান হউন, নচেৎ এই উৎকট পরীক্ষার দিনে মুস্কিল হইতে পারে। আমাদের বড়ই ভাগ্য বলিতে হইবে যে, ভগবান সৃষ্টির প্রথম হইতেই একাজটি আমাদের পক্ষে নিতান্ত সহজ করিয়া রাখিয়াছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র ইহাদের এক একটী যেন একটি ঘড়ী। আর সে কেমন ঘড়ি! মানুষে যত বুদ্ধি করিয়া ঘড়ি তয়ের করুক না কেন, সে ঘড়ির ভুল চুক আছে, কিন্তু ভগবানের এ সকল ঘড়ির ভুল চুক নাই। যদি থাকিত, তবে আর আমাদের সময়ের খাঁটি হিসাব রাখা হইত না।

মানুষের জন্মাবধিই দিন রাত্রির হিসাব চলিয়া আসিয়াছে। এটিই হইল সকলের চেয়ে পুরাতন আর সোজা হিসাব। আগে 'এক দিন' 'দু দিন' 'সকাল' 'সন্ধ্যা', এমনি করিয়াই হয়ত মোটা মুটি হিসাবেই কাজ চলিত; সপ্তাহ, মাস, বৎসর, ঘণ্টা, মিনিট' প্রভৃতির কথা লোকে পরে শিখিয়াছে।

দিনের হিসাবটি খুবই সোজা বটে, কিন্তু কোথা হইতে দিনের আরম্ভ ধরিতে হইবে, একথাটা প্রাচীন কালের লোকদের কাছে যেন একটু কঠিন বোধ হইয়াছিল। প্রাচীন কাল্‌-ডিয়া দেশের লোকেরা আমাদের মতন করিয়া সকাল হইতে দিনের আরম্ভ ধরিত। ইহুদীরা সন্ধ্যাবেলাটাকে বলিত দিনের প্রথম। আবার মিশর আর প্রাচীন গ্রীস দেশে রাত্রির

মধ্যভাগ হইতেই দিনের হিসাব করিবার নিয়ম ছিল। সাহেবেরা সেই হিসাব তাহাদের নিকট পাইয়া আমাদের দেশে আনিয়া তাহা উপস্থিত করিয়াছেন। তাই আমরা মনে মনে ভাবি যে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই দিনের আরম্ভ, কিন্তু কাজের সময় বলি যে তখন ছয়টা বাজে। অর্থাৎ আসলে হিসাবটি ধরা হয় রাত বারোটার পর হইতে।

আমরা দিন পাইয়াছি সূর্য্যের নিকট, আর মাস পাইয়াছি চাঁদের নিকট। মাস্ শব্দের অর্থই চন্দ্র। চাঁদের মুখখানি যে একদিন ঠিক গোল থাকে, তারপর কমিতে কমিতে একেবারেই মিলাইয়া যায়, তারপর আবার বাড়িতে বাড়িতে যেমন গোল ছিল তেমনিটি হয়, এই ব্যাপারটা সে কালের লোকদিগের নিকট বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। তাহারা নিশ্চয়ই বিশেষ কৌতূহলের সহিত ইহার সংবাদ লইত আর এই ঘটনাগুলি ঘটিতে কত সময় লাগে, বারবার তাহা গণিয়া দেখিত। এই সময়টুকু ঊনত্রিশ দিনের একটু বেশী, ত্রিশ দিনের একটু কম। মোটা মুটি ইহাকে ত্রিশ দিন ধরিয়া, সেই পরিমাণ সময়কে এক 'মাস' বলা হয়।

মাসের হিসাব হইতেই বোধ হয় সপ্তাহের হিসাব আসিয়াছিল। অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে দুইভাগ করিলে প্রায় সওয়া সাত পাওয়া যায়। ইহার খুচরা টুকু বাদ দিলেই সাত দিন হয়। সে কালের লোকে আকাশে যে সাতটি জিনিসকে সর্ব্বদা চলাফেরা করিতে দেখিত, সে ছিল সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, আর শনি। ইহাদের নামেই তাহারা এই সাতটি দিনের নাম রাখিল।

ইংরাজেরা কিন্তু এই সাত নামের সকলগুলি ব্যবহার করেন না। তাঁহারা মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি আর শুক্রের জায়গায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের চারিটি দেবতার নাম বসাইয়া লইয়াছেন। সনডে (Sunday) সূর্য্যের দিন, মনডে (Monday) চন্দ্রের দিন, টিউস্‌ডে (Tuesday) টিউ নামক দেবতার দিন, ওয়েড্‌নেস্‌ডে (Wednesday) ওডিন্ নামক দেবতার দিন, থর্‌সডে (Thursday) থর্ নামক দেবতার দিন, ফ্রাইডে (Friday) ফ্রীয়া নামক দেবতার দিন, স্যাটার্‌ডে (Saturday) শনির দিন; এই হইল ইংরাজী মতে সাতটি বারের নাম।

এই সকল দেবতার বৃত্তান্ত শুনিতে বেশ লাগে। আগামীতে তাহা তোমাদিগকে বলিব, আজ উপস্থিত কাজটা সারিয়া লই।

সূর্য্যের কাছে দিন, চাঁদের কাছে মাস আর সপ্তাহ পাইলাম,—বৎসর পাইলাম কাহার কাছে? এখন আমরা অবশ্য মাষ্টার মহাশয়ের নিকট শুনিতে পাই যে, পৃথিবী

একবার সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিয়া আসিলে এক বৎসর হয়। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় যখন ছিলেন না, বছরটা তখনও ছিল। কথাটা খুলিয়া বলি।

পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিয়া আসিল, একথাটা বুঝিতে অনেকখানি বিদ্যার দরকার। অতি প্রথমে লোকের এত বিদ্যা না থাকারই কথা; কিন্তু তখনও তাহারা মোটা মুটি বুঝিতে পারিত যে, একটি বছর গেল, নূতন বৎসর আসিল। গ্রীষ্মের পরে বর্ষা, বর্ষার পরে শরৎ, তারপর হেমন্ত, তারপর শীত, তারপর বসন্ত। এ সকল পরিবর্ত্তন বুঝিতে কিছু মাত্র হিসাবের দরকার হয় না। বর্ষা যে আসিয়াছে, একথা আমি এই কয়েক ছত্র লিখিতে লিখিতে পঞ্জিকা না দেখিয়াও বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছি। চাষারা একথা আরো ভাল করিয়া বুঝিয়া তাহাদের কাজে লাগিয়াছে। কোন সময় আকাশের, মাটীর, জলের বা মেঘের অবস্থা কিরূপ হইবে; চাষারা মাষ্টার মহাশয়কে না বলিয়াই তাহার মোটামুটি সংবাদ রাখে, আর সেই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই বৎসরের একটা চলন সই হিসাবও পাওয়া যায়। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের সংসার যাত্রা আর সুখ দুঃখ এমন ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে যে, ইহার সংবাদ না লইলে আমাদের চলেই না। কাজেই আমরা বৎসরের হিসাব সকলেই লইয়া থাকি।

এই হিসাব আগে বোধ হয় মোটামুটি এইরূপ ছিল যে, চাঁদের বারোটি মাস হইলে বছরটা ফিরিয়া আসে। তারপর যখন সূর্য্যের গতিবিধি আর একটু ভাল করিয়া জানা গেল, তখন বৎসরের জ্ঞানও অনেক পরিষ্কার হইল। তখন দেখা গেল যে, চাঁদের হিসাব আর সূর্য্যের হিসাব ঠিক একরূপ নহে, চাঁদের বারোটি মাসে ঠিক এক বৎসর পূর্ণ হয় না। চাঁদের বারো মাসে প্রায় ৩৫৪ দিন হয়, আর সূর্য্যের চারিধারে পৃথিবীর একবার ঘুরিয়া আসিতে প্রায় ৩৬৫ দিন লাগে।

সেই হইতে আমরা ৩৬৫ দিনে বৎসর গণি। ইহার আর একটু সূক্ষ্ম হিসাব আছে, কিন্তু তাহার কথা এখানে পাড়িবার প্রয়োজন নাই। বারোটি মাসের মধ্যে এই ৩৬৫ দিন ভাগ করিয়া দিয়া এখন সকল সভ্য দেশের লোকেই কাজ চালায়। মাসের কথা উঠিলে আমরা মনে করি ত্রিশ দিন।

কিন্তু সকল মাস যে ত্রিশ দিনে হয় না, একথা কাহারও অজানা নাই। মাসও যে সকল দেশেই চিরকাল বারোটা করিয়া ধরা হয় তাহাও নহে। ইহার প্রমাণ দেখ,—ইংরাজিতে বৎসরের শেষ চারিটি মাসের নাম, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বর আর ডিসেম্বর, অর্থাৎ সপ্তম, অষ্টম, নবম আর দশম মাস। ইংরাজেরা মাসের নামগুলি

রোমানদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। সে দেশে প্রাচীনকালে দশ মাসেই বৎসর ধরা হইত। তখন মার্চ্চ মাস ছিল বৎসরের প্রথম মাস। জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি এই দুটি মাস শেষে যোগ করা হইয়াছিল। তখনকার বৎসরের হিসাব কতকটা খাম-খেয়ালী রকমেই চলিত বলিয়া বোধ হয়। সে দেশের পুরোহিতেরা ইচ্ছা করিলেই বৎসরের ভিতরে দু চারটা অতিরিক্ত দিন ঢুকাইয়া দিতে পারিতেন। কাজেই বৎসর কোথায় আরম্ভ হইবে, কোথায় শেষ হইবে, তাহার কোন ঠিকানা থাকিত না। ইহার ফলে শেষটায় এমনি গোলমাল হইয়া দাঁড়ায় যে, সম্রাট জুলিয়স্ সীজারের সময়ে একটি বৎসরে মাস হইয়াছিল পোনেরটি, আর দিন ৪৫৫টি।

চীনদেশে চাঁদের হিসাবটারই খুব চলন। অমাবস্যায় তাহাদের প্রত্যেকটি মাস আরম্ভ হয়। প্রতি আড়াই বৎসর পরে তাহারা একটি করিয়া অতিরিক্ত মাস বৎসরের সঙ্গে যোগ করিয়া লয়। অবশ্য, এমন করিলে আর ঋতু সকলের সঙ্গে বৎসরের বিশেষ যোগ থাকে না, কাজেই ধান বোনা, ধান কাটা ইত্যাদি কাজের সময়ের হিসাব রাখা চাষাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। এইজন্য সে দেশের পঞ্জিকায় এসকল কাজের তারিখ লিখিয়া দিতে হয়। সেখানকার চাষাদেরও পঞ্জিকা না হইলে চলে না; সুতরাং সেখানে পঞ্জিকার কি রকম কাট্‌তি, বুঝিতেই পার।

প্রাচীনকালে চীনদেশে বৎসরের আর ঘণ্টার নাম রাখা হইত; যেমন কুকুরের বৎসর, ড্রাগনের বৎসর ইত্যাদি। আমরা বলি, "বারোটা বাজিয়াছে", সেকালের চীনেরা বলিত, "ঘোড়ার ঘণ্টা বাজিয়াছে।" এখনও নাকি সে দেশে এমন সব ঘড়ি আছে, যাহাতে "ইঁদুরের ঘণ্টা" "ঘোড়ার ঘণ্টা" এসকল বাজিয়া থাকে। রাত দুপুরের সময়টা হচ্ছে সেদেশের "ইঁদুরের ঘণ্টা"। আমাদের এক ঘণ্টা হয় ৬০ মিনিটে, চীনেদের একঘণ্টা হয় ১২০ মিনিটে।

জাপানী দেবতা।

গগন-আলোর যে নাতি, তাঁর ছিল তিন ছেলে; দীপ্তানল, ক্ষিপ্তানল আর তৃপ্তানল।

দীপ্তানল মাছ ধরেন আর তৃপ্তানল শিকার করেন। একদিন তৃপ্তানল দীপ্তানলকে বল্লেন, "দাদা, চলনা, তোমার কাজটা আমি করি, আর আমার কাজটা তুমি কর,—দেখি কেমন হয়।" বলে, নিজের তীর ধনুক দাদাকে দিয়ে, দাদার বড়শী আর ছিপ তিনি

চেয়ে নিলেন। নিয়ে মাছ ত ধরলেন খুবই, লাভের মধ্যে বড়শীটা মাছে ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

তার পর একদিন দীপ্তানল বল্লেন যে, "ভাই, সখ কি মিটেছে? এখন কেন আমার বড়শী আর ছিপ আমাকে ফিরিয়ে দাও না।" তাতে তৃপ্তানল ভারি লজ্জিত হয়ে বল্লেন যে, "দাদা. বড়শী ত মাছে নিয়ে গেছে, এখন কি করে দিই?" এ কথায় দীপ্তানল যার পর নাই রেগে বল্লেন যে, "সে আমি জানি না; আমার বড়শী আমাকে এনে দাও।"

তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, নিজের তলোয়ারখানা ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে তাই দিয়ে বড়শী বানিয়ে দাদাকে দিলেন। কিন্তু দাদার তাতে মন উঠ্‌ল না; তিনি বল্লেন, "ও আমি চাই না; আমার যে বড়শী নিয়েছ, তাই এনে আমাকে দাও!"

তৃপ্তানল হাজার বড়শী এনে দীপ্তানলকে দিতে গেলেন, তাতেও হল না। দীপ্তানল আরো রেগে গিয়ে বল্লেন, "আমার সেই বড়শীটি আমাকে এনে দিতে হবে।" তা শুনে তৃপ্তানল মাথা হেট করে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে সেখান থেকে চলে গেলেন। ভাবলেন, "হায় হায়! এখন আমি কি করি? সমুদ্রের মাছে বড়শী নিয়ে গেছে, তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব?"

এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে কাঁদ্‌ছেন, এমন সময় সমুদ্রের দেবতা লবণেশ্বর সেইখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি হয়েছে বাছা? তুমি কাঁদছ কেন?" তৃপ্তানল বল্লেন, "দাদার বড়শী নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেটা মাছে নিয়ে গেছে। তাতে দাদা বড্ড রাগ করেছেন। আমি আর কত কাঁটা তাঁকে দিতে গেলাম, তিনি কিছুই নিলেন না, বল্লেন, আমার সেইটে এনে দাও। এখন আমি কি করি?" লবণেশ্বর বল্লেন, "তুমি কেঁদনা, আমি যা বল্‌ছি তাই কর।" বলে, তিনি তখনি একখানা নৌকা তয়ের করে তৃপ্তানলকে তাতে বসিয়ে দিলেন, আর বল্লেন যে, "এই নৌকায় চড়ে তুমি এই এই পথ দিয়ে যেতে থাক্‌বে। খানিক দূর গিয়ে মাছের আঁস দিয়ে গড়া একটা চমৎকার বাড়ী দেখ্‌তে পাবে, সেইখানে সমুদ্রের রাজা সিন্ধুপতি থাকেন। সেই বাড়ীর পাশে, বাগানের ভিতরে, কূয়োর ধারে একটা গাছ আছে; তার আগায় উঠে তুমি বসে থাক্‌বে। সেই বাগানে রাজার মেয়ে বেড়াতে আসে, সে তোমাকে তোমার বড়শীর কথা বলে দিবে।"

একথায় তৃপ্তানল সেই নৌকা বেয়ে, সেই রাজার বাড়ীতে গিয়ে সেই গাছে উঠে বসে রইলেন। খানিক বাদে রাজার মেয়ের দাসীরা কলসী হাতে করে সেই কূয়ো থেকে

জল নিতে এল। এসে তারা দেখল যে গাছের উপরে কেমন সুন্দর একটি রাজপুত্র বসে আছে। তৃপ্তানল তাদের বল্লেন, "হাঁ গা, তোমরা দয়া করে আমাকে একটু জল খেতে

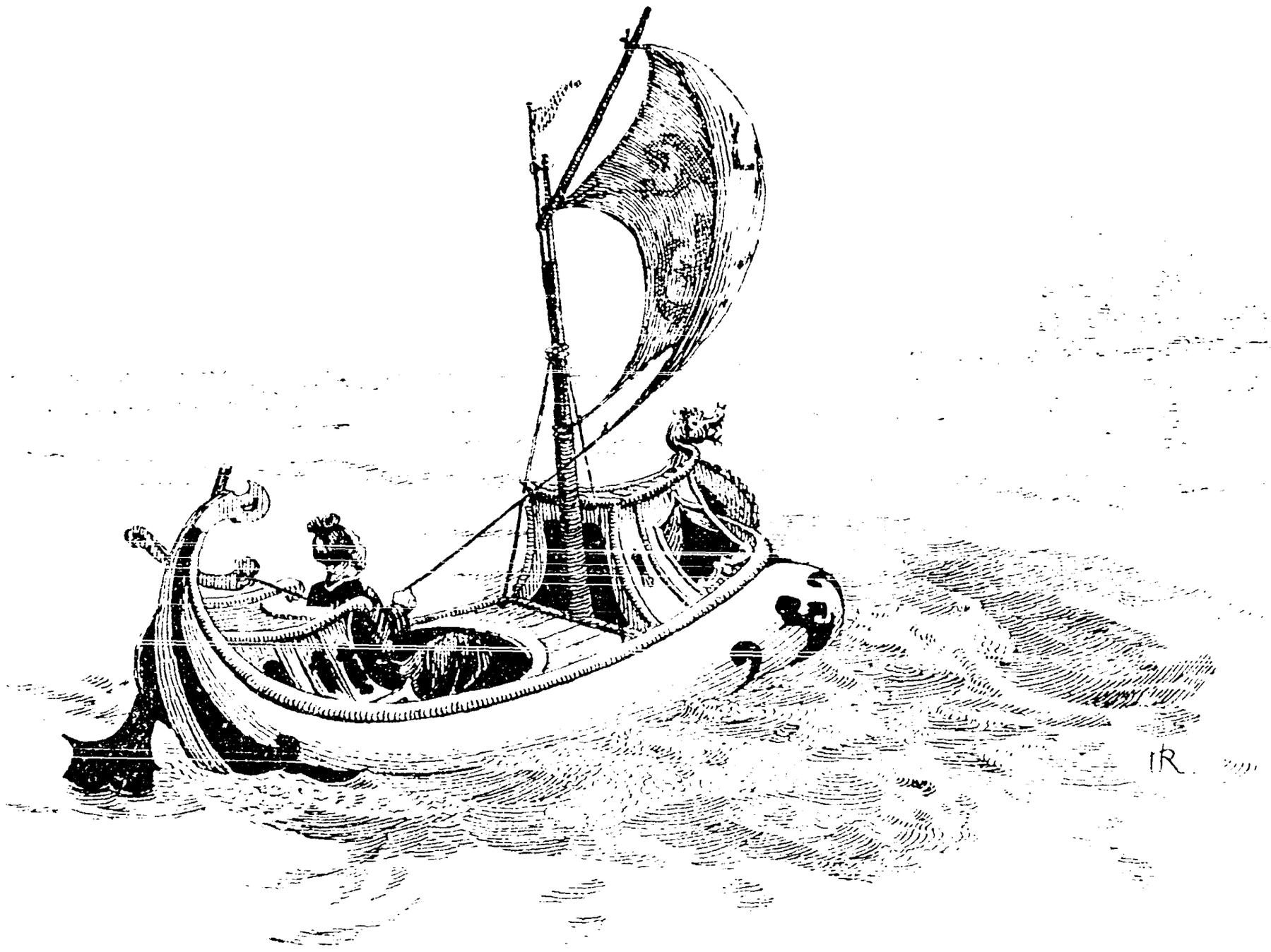

তৃপ্তানল নৌকায়েগে যাচ্ছেন।

দেবে ?" দাসীরা অমনি সোণার গেলাসে করে জল এনে তাঁকে খেতে দিল। তিনি তা থেকে একটুখানি জল খেলেন। তারপর গেলাস ফিরিয়ে দিবার সময় নিজের গলা থেকে মণি খুলে তার ভিতর ফেলে দিলেন। দাসীরা তা দেখ্‌তে পায়নি, তারা সেই মণিশুদ্ধ গেলাস নিয়ে রাজার মেয়ের ঘরে রেখে দিয়েছে।

তার পর রাজার মেয়ে জলখাবার জন্য গেলাস খুঁজতে এসে বল্লেন,—"এ কি ? গেলাসের ভিতর মণি কোথেকে এলরে ?" দাসীরা বল্লে, "তা ত আমরা জানি না, কূয়োর ধারে একটি রাজপুত্র বসে আছে, সে আমাদের কাছে জল খেতে চাইল, আমরা এই গেলাসে করে নিয়ে তাকে জল খেতে দিলাম। মণি হয় ত তারি হবে।"

রাজার মেয়ে তখনি ছুটে গিয়ে তাঁর বাবাকে সব কথা বল্লেন। রাজা সিন্ধুপতিও একথা

শুনেই তাড়াতাড়ি সেই কূয়োর ধারে চলে এলেন। এসে সেই গাছের উপরে তৃপ্তানলকে দেখেই তিনি যার পর নাই আশ্চর্য্য আর খুসী হয়ে বল্লেন, "আরে, তোমার নাম না তৃপ্তানল? আমাদের স্বর্গের রাণী গগন-আলোর নাতির ছেলে! তুমি কেন কূয়োর ধারে বসে থাক্‌বে বাবা? এস এস, ঘরে এস!" বলে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে রাজা তাঁকে সভায় নিয়ে এলেন। সভার লোক তাঁর নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁকে সেলাম করে যোড় হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর রাজা অনেক ধূমধাম করে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

তার পর থেকে বেশ সুখেই দিন যায়। রাজা রোজই খবর নেন, তৃপ্তানল কেমন আছেন; রাজার মেয়ে বলেন 'বেশ ভাল আছেন।' এমনি করে তিন বৎসর চলে গেল। তার পর একদিন রাজা খবর নিতে এসে শুনলেন যে, তৃপ্তানল বিছানায় শুয়ে একটা খুব লম্বা নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অমনি রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, তুমি কেন নিশ্বাস ফেলেছিলে? তোমার কিসের দুঃখ?" তৃপ্তানল বল্লেন, "দাদার বড়শী নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেই বড়শী মাছে নিয়ে গেছে। এতে দাদার বড্ড রাগ হয়েছে, আর বলেছেন যে সেই বড়শী তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে কিছুতেই হবে না। শুনে রাজা বল্লেন, "এই কথা? আচ্ছা,—ডাক্‌তরে সকল মাছকে!" রাজার হুকুমে পৃথিবীর যত মাছ সকলে এসে তাঁর কাছে হাজির হল, আর রাজা তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল ত, তোমাদের কা'র গলায় সেই বড়শী আট্‌কে ছিল?" তারা সকলে বল্লে যে, "'তাই' মাছের গলায় সেই বড়শী আট্‌কে ছিল। আজও তার খোঁচা লাগে।" তখন রাজা মশাই তাইকে বল্লেন, "হাঁ কর্ ব্যাটা, দেখি তোর গলায় কি আছে!" একথায় তাই যেই 'অ-অ-অ-অ-ক্!' করে দু হাত চওড়া হাঁটি করেছে, অমনি দেখা গেল যে ঠিক সেই বড়শীটি তার গলায় বিঁধে রয়েছে। অমনি চিমটা দিয়ে সেটিকে বার করে আনা হল। তখন ত আর তৃপ্তানলের আনন্দের সীমাই রইল না। রাজা মশাই তাঁর হাতে সেই বড়শীটি দিয়ে আরো দুটি মাণিক তাঁকে দিলেন। তার একটির নাম জোয়ার মাণিক তাকে ছুঁড়ে মার্‌লে সমুদ্র ছুটে এসে শত্রুকে ডুবিয়ে দেয়। আর একটীর নাম ভাঁটা মাণিক; তাকে ছুঁড়ে মার্‌লে সেই সমুদ্র ফিরে চলে যায়।

তার পর কুমীরের রাজাকে ডেকে রাজা সিন্ধুপতি বল্লেন, "তুমি তৃপ্তানলকে তার দেশে পৌছিয়ে দিয়ে এস। দেখো যেন তার কোন কষ্ট না হয়।

সেই পাহাড়ের মত কুমীর তৃপ্তানলকে পিঠে করে তাঁর দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। তার পর দীপ্তানলকে তাঁর বড়শী ফিরিয়ে দিতে আর বেশীক্ষণ লাগলনা।

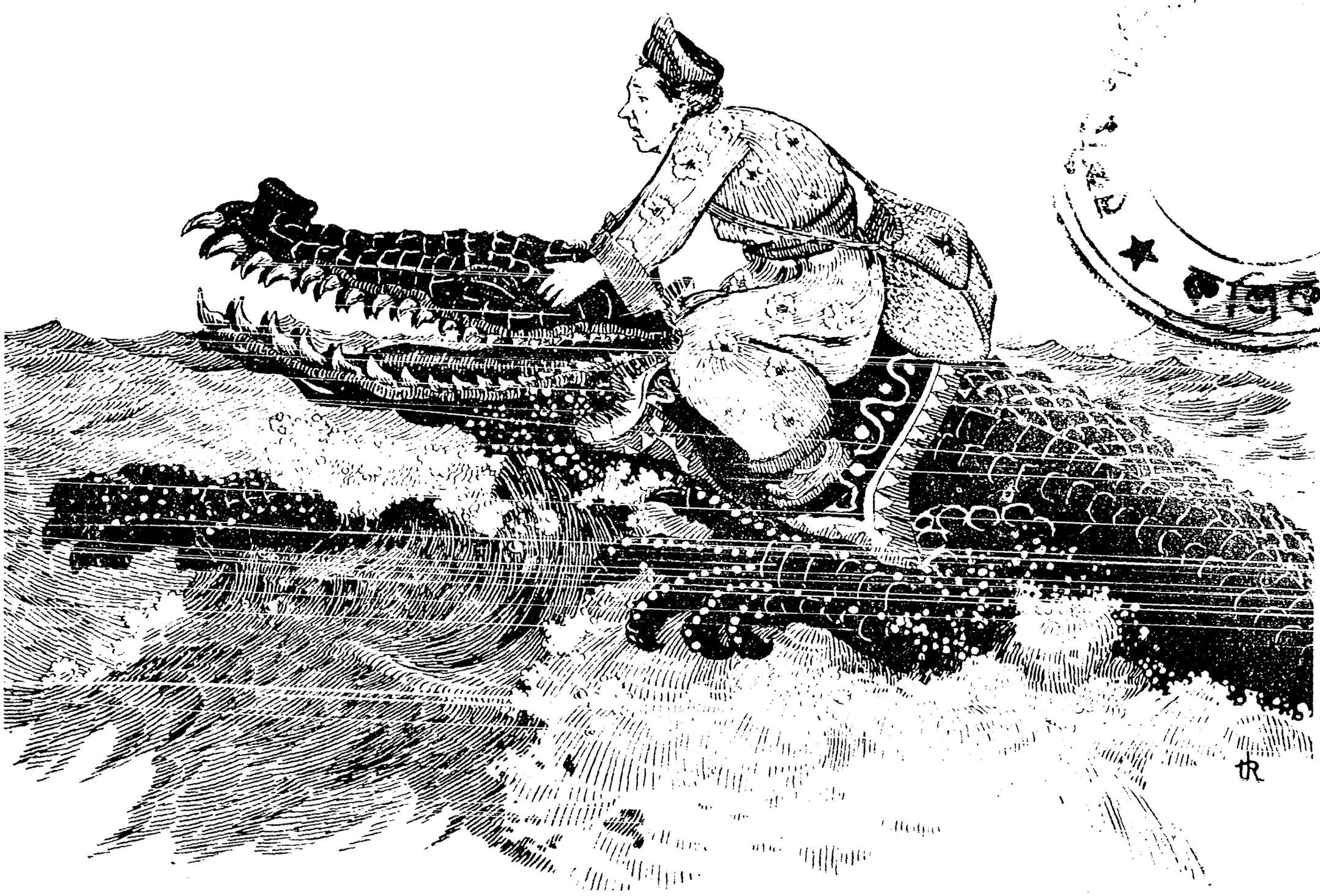

কিন্তু দীপ্তানল কোথায় তাঁর বড়শী পেয়ে খুসী হবেন, না তিনি আরো রেগে তলোয়ার নিয়ে তৃপ্তানলকে কাট্‌তে গেলেন। তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, তাড়াতাড়ি সেই জোয়ার মানিকটি ছুঁড়ে মারলেন। মারতেইত সমুদ্রের জল পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে এসে দীপ্তানলকে ভাসিয়ে নিয়ে চল্লো। তখন আর তিনি যাবেন কোথায়? ঢক্ ঢক্ করে জল খেতে খেতে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগলেন, রক্ষে কর ভাই! আমার ঘাট হয়েছে, আমি আর অমন করব না।" সে কথায় তৃপ্তানল ভাটা মানিক ছুঁড়ে জল সরিয়ে দিয়ে তাঁকে বাঁচালেন।

তার পর থেকে দীপ্তানল ভাল মানুষ হয়ে গেলেন, আর ছোট ভাইকেই রাজ্য ছেড়ে দিলেন।

হিমের দেশ।

আজ তোমাদিগকে ফ্রাঙ্ক্‌লিনের কথা বলিব, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, বরফের দেশে চলা ফেরার কি কষ্ট।

ফ্রাঙ্কলিন তিনবার বরফের দেশে গিয়াছিলেন। প্রথমবারে উত্তর আমেরিকার খানিকটা জায়গা দেখিবার জন্য সরকার হইতে তাঁহাকে পাঠান হয়; সঙ্গে ডাক্তার রিচার্ডসন্, লেফ্‌টেন্যাণ্ট ব্যাক্, আর কয়েকটি লোক ছিলেন। ইঁহারা ইঁহাদের কাজ ভাল করিয়াই করিয়াছিলেন, কিন্তু কষ্ট যাহা পাইয়াছিলেন তেমন অতি অল্প লোকেই পায়। পথের কষ্ট, শীতের কষ্ট, ক্ষুধার কষ্ট, কোনটাই কম ছিল না। একদিনের কথা ফ্রাঙ্কলিন বলিতেছেন ঃ-

"রাত দুপুর হইতে ভোর পাঁচটা অবধি মুষলধারে বৃষ্টি হইল। সকালে বরফ পড়িতে আরম্ভ করিল, ঝড়ও আসিল ভয়ঙ্কর। খাবার কিছুই নাই, আগুন ও জ্বালান গেল না; কাজেই সারাদিন বিছানায় পড়িয়াই কাটাইলাম। তাঁবুর ভিতরে বরফ আসিয়া ঢুকিতেছে; সামান্য কম্বল, তাহাতে শীত বারণ হয় না। পরদিনও ঝড়ের বিরাম নাই। তাঁবুর উপরে বরফ জমিয়াছে, চারিদিকে তিন ফুট উঁচু হইয়া বরফ পড়িয়াছে। আমাদের কম্বলের উপরেও বরফ কয়েক ইঞ্চি পুরু।"

রাত্রে সকল দিন আগুন জ্বালিবার সুবিধা হইত না, অন্ধকারেই খাওয়া দাওয়া সারিয়া বিছনায় শুইতে হইত। কম্বলে বরফ জমিয়া থাকিত, সেই বরফ শরীরের তাপে গলিয়া কম্বল গরম না হইলে ঘুমাইবার যো ছিল না। কাপড় চোপর ভিজা থাকিলে তাহা শুদ্ধই ঘুমাইতে হইত, নহিলে তাহা শীতে জমিয়া যাইত, পরদিন আর তাহা পরিবার উপায় থাকিত না।

এইত গেল শীতের কষ্ট, তারপর পথের কষ্টের কথা শুন। দুখানা ডোঙ্গা মুটের মাথায় করিয়া লইয়া পথ চলিতে হইতেছে, নহিলে নদী সামনে পড়িলে পার হইবার উপায় নাই। জমিতে বরফ এক ফুট উঁচু। বিলের জল জমিয়া গিয়াছে, তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইতে হয়! সে জল আবার ভাল করিয়া জমে নাই, ক্রমাগতই তাহার ভিতরে হাঁটু অবধি পা ঢুকিয়া যায়। মুটেরা নৌকা বহিতে বহিতে তাহা শুদ্ধ পা হড়কাইয়া পড়িয়া যায়। ঝড় এমনি যে, অনেক সময় তাহাতেও মুটেগুলোকে ঠেলিয়া

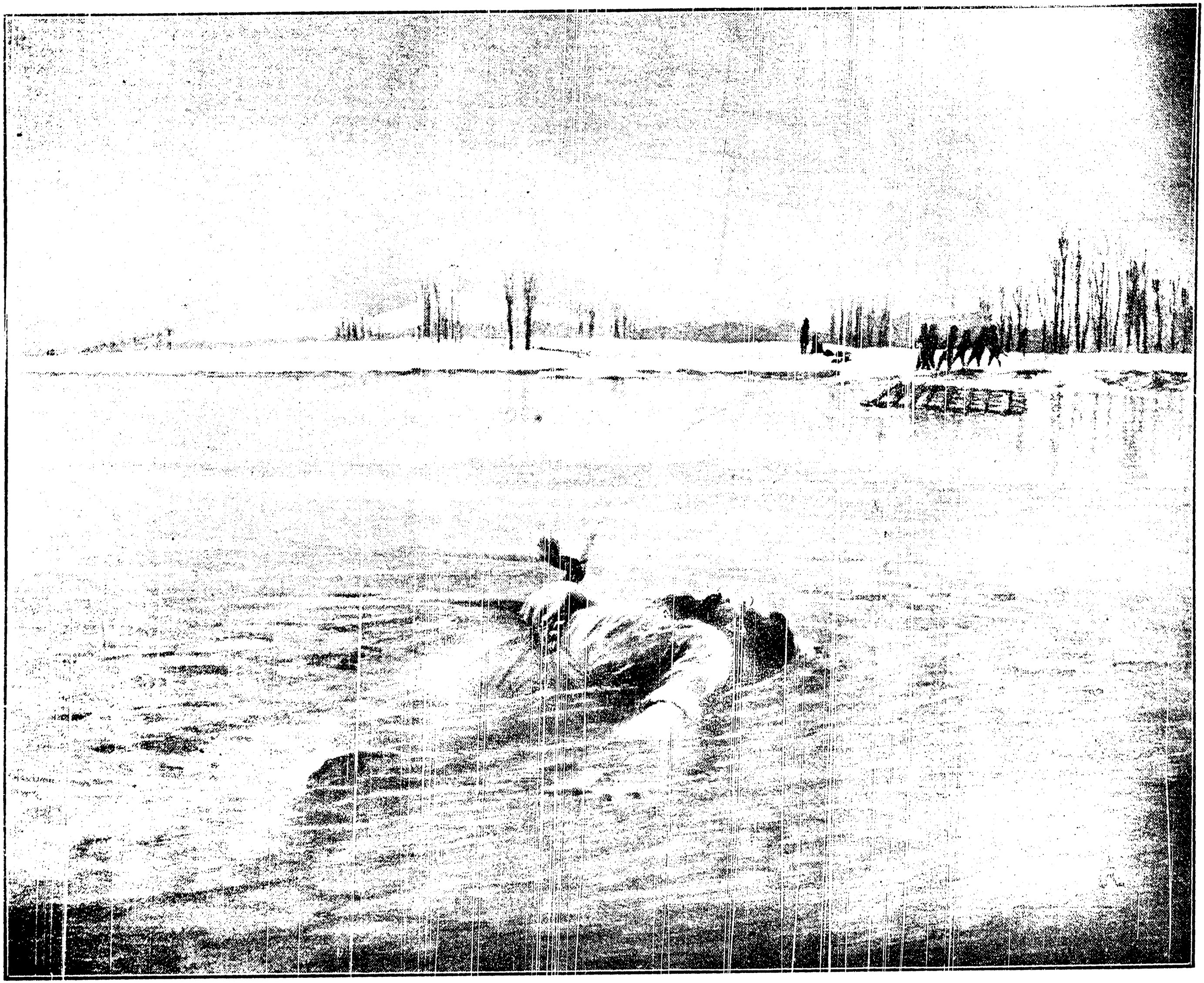

তখন এ পারের লোকেরা প্রাণপণে দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল, তাহাতে তিনি স্রোতের জোরে আবার ভাসিয়া উঠিলেন।

ফেলিয়া দেয়। এমনি করিয়া একবার বড় ডোঙ্গাখানি একেবারে চুরমার হইয়া গেল। ছোট নৌকাখানি এতই ছোট যে তাহাতে করিয়া নদী পার হওয়া অসম্ভব। পা হইতে কোমর অবধি জলে ভিজিয়া গিয়াছে, বরফ জমিয়া কাপড় কাঠের মত হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ চলিতে ভয়ানক কষ্ট হয়।

বড় ডোঙ্গাখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ছোটখানি নিতান্তই ছোট,—এই অবস্থায় নদী সামনে পড়িয়াছে, তাহা পার হইতে হইবে। এখন গাছ কাটিয়া ভেলা তয়ের করা ভিন্ন আর উপায় নাই। ক্ষুধায়, শীতে আর পরিশ্রমে শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার উপরে এমন কঠিন কাজ কি করিয়া করা যাইবে? এমন সময় এক পাহাড়ের ফাটলে একটা মরা হরিণ পাওয়া গেল। সে কয়েক মাস আগের মরা,—পচিয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষুধায় যাহাদের প্রাণ যায়, তাহাদের কি অত ভাবিলে চলে? কাজেই তখন তখন আগুন জ্বালিয়া সেই পচা হরিণই সকলে আনন্দ করিয়া খাইল। তারপর গাছ কাটিয়া ভেলা তয়ের করিতে আর তেমন কষ্ট বোধ হইল না। কিন্তু এত পরিশ্রমে যে ভেলা তয়ের হইল, তাহা জলে ভাসাইতে গিয়া দেখা গেল যে তাহা আপনা হইতেই ডুবিয়া যাইতে চাহে।

তখন ডাক্তার রিচার্ডসন্ বলিলেন, "আমি আগে একগাছি দড়ি লইয়া নদী সাঁতরাইয়া পার হই। সেই দড়িতে ভেলা বাঁধা থাকিলে, তাহাকে টানিয়া কোন মতে ওপারে পৌঁছান যাইবে। ডাক্তার রিচার্ডসনের শরীরে কিছুমাত্র বল নাই, ক্ষুধায় আর শীতের কষ্টে তাঁহার খালি চামড়া আর হাড় কখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে। নদী পার হইতে গিয়া তিনি বাঁচেন কি মরেন, তাহা বড়ই সন্দেহের কথা। কিন্তু তিনি সে কথা ভাবিয়া দেখিলেন না। দড়ি লইয়া তিনি জলে নামিতে যাইতেছেন, এমন সময় একটা ছোরায় পা পড়িয়া পা ভয়ানক কাটিয়া গেল। তাহাতেও তাঁহার গ্রাহ্য নাই, কোমরে দড়ির মাথা বাঁধিয়া তিনি সেই কাটা পা শুদ্ধই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু খানিক দূর যাইতে না যাইতেই তাঁহার হাত দুখানি শীতে অবশ হইয়া গেল। তথাপি তিনি ছাড়িবার লোক নহেন,—চিৎ হইয়া শুধু পায়েই সাঁতরাইতে লাগিলেন। এমনি করিয়া তিনি প্রায় নদী পার হইয়া গিয়াছেন, এমন সময়ে তাহার পা দুখানিও অবশ হইয়া গেল, তিনি ডুবিয়া যান আর কি। তখন এ পারের লোকেরা প্রাণপণে দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল, তাহাতে তিনি স্রোতের জোরে আবার ভাসিয়া উঠিলেন। তারপর অনেক কষ্টে যখন তাঁহাকে টানিয়া এপারে আনা হইল, তখন তাঁহার প্রাণ যায় যায়। সেই মুহূর্ত্তেই

সকলে তাঁহাকে কম্বল জড়াইয়া সেকিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাঁহার উঠিয়া বসিতে প্রায় সমস্ত দিন লাগিয়াছিল। ইহার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরের ডান দিকটা অসাড় বোধ হইত।

ক্ষুধার কষ্টের কথা আর বেশী করিয়া কি বলিব? ঐ পচা হরিণ খাওয়ার ঘটনা হইতে তোমরা কতক বুঝিতে পারিয়াছ। দু তিন দিন ধরিয়া উপবাস ত তাঁহাদের প্রায়ই করিতে হইত। না খাইয়া সকলেই অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া গিয়াছিলেন। সামান্য একটু খাবার পাইলে সকলে তাহা টুকরা টুকরা করিয়া বাঁটিয়া খাইতেন। পেরো নামক তাঁহাদের দলের একজন লোক ইহার ভিতর হইতে আবার কিছু কিছু মাংস বাঁচাইতে লাগিল। তারপর একদিন যখন সে সকলকে ডাকিয়া সেই মাংস হইতে এক এক টুকরা প্রত্যেককে খাইতে দিল, তখন আর কেহই চখের জল রাখিতে পারিল না।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে বরফের নীচে একটা হরিণের হাড় আর খানিকটা চামড়া পাওয়া গেল। হরিণটা আগের বৎসর বসন্তকালে মারা গিয়াছিল: নেকড়ে বাঘে তাহাকে খাইয়া ঐ টুকু মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছে। তখন তখনই সেই হাড় আর চামড়া পোড়াইয়া সকলে খাইতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ আবার নিজের পুরাণো জুতাও তাহার সঙ্গে মিশাইয়া লইল। জুতা খাওয়া তাঁহাদের ভাগ্যে আরো ঘটিয়াছে, অনেক সময় আবার তাহাও ঘটে নাই। শরীরের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে লাঠি ভর দিয়া চলিতে হইত। ক্ষুধা সহ্য করিয়া করিয়া তাঁহাদের ক্ষুধা বুঝিবার শক্তিই চলিয়া গিয়াছিল। একথা শুনিলে বড়ই কষ্ট হয় যে সে সময়ে খাওয়া দাওয়ার আমোদের কথা ভিন্ন আর কিছুই তাঁহাদের ভাল লাগিত না। ক্রমে তাঁহাদের কাজ কর্ম্ম করিবার শক্তি চলিয়া যাইতে লাগিল। একবার বসিলে আর সহজে উঠিতে পারেন না, একজন আর একজনকে টানিয়া তুলিতে হয়।

এই বিপদের উপর আর এক নূতন বিপদ যে দেখা দিল, সে আরো ভয়ঙ্কর। মিশেল্ নামে তাঁহাদের সঙ্গের একটা লোক গোপনে দলের আর দুজন লোককে মারিয়া খাইয়া ফেলিল। সময়ে টের পাইয়া তাহাকে গুলি করিয়া না মারিলে নিশ্চয়ই সে আরো অনেককে খাইত।

দেশ হইতে যাত্রা করিবার সময় তাঁহারা স্বপ্নে ও ভাবেন নাই যে এত কষ্ট তাঁহাদিগকে পাইতে হইবে। তাঁহাদের খাবার জিনিস জোগাইবার ভার যাহারা লইয়াছিল, তাহাদের কেহই সে কাজ করে নাই, তাহার ফলেই এত বিপদ। কয়েক মাস পূর্ব্বে

আকাইচো নামে একজন ইণ্ডিয়ান (আমেরিকার অসভ্য) সর্দ্দার তাহার দলবল লইয়া ইহাদের সঙ্গে ছিল, এ সময়ে তাহাকে পাইলেও অনেক উপকার হইত। ইহারা বেশ ভাল লোক ছিল। ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে থাকিবার সময় নানারূপে তাঁহাদের সেবা করিতে ত্রুটি করে নাই। খাদ্যের কষ্ট যখন উপস্থিত হইল, তখন নিজেরা না খাইয়া তাঁহাদিগকে খাইতে দিয়াছে। বলিয়াছে, "আমাদের উপবাস করিবার অভ্যাস আছে, তোমাদের নাই।"

আকাইচোকে এখন পাইলে খুবই ভাল হইত, কিন্তু সকলেই আধমরা, তাহাকে খুঁজিতে কে যাইবে ? তখন লেফটেন্যাণ্ট ব্যাক্ সেই দুর্ব্বল শরীরেই আর তিন জনকে সঙ্গে লইয়া আকাইচোর খোঁজে বাহির হইলেন। কি ভীষণ কষ্ট সহিয়া যে ব্যাক্ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার স্থান এখানে নাই। অনেক দিন তাঁহাদিগকে পুরানো জুতা, চামড়ার পেণ্টালুন আর বন্দুকের খোল, এইরূপ সব জিনিস খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। সঙ্গের একজন লোক ত এত কষ্ট সহিতে না পারিয়া মরিয়াই গেল।

যাহা হউক, শেষে আকাইচোকে পাওয়া গেল, ফ্রাঙ্কলিন এবং তাঁহার দলের লোকের বিপদও কাটিল। ইহার পূর্ব্বেই ক্ষুধায় তাঁহাদের দলের একজন মারা গিয়াছিল। আকাইচো না আসিলে নিশ্চয় সকলেরই সেই দশা হইত। আকাইচো আর তাহার লোকেরা যার পর নাই স্নেহের সহিত তাঁহাদের সুশ্রূষা করিয়া সকলকে বাঁচাইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এত কষ্টের ভিতরেও ফ্রাঙ্কলিন আর তাঁহার সঙ্গের লোকেরা নিজের কাজে ত্রুটি করেন নাই। সেই কাজের পরিমাণ যে কতখানি, তাহা এ কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সে যাত্রা জলে স্থলে তাঁহাদিগকে ৫৫৫০ মাইল পথ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল।

ক্রমশঃ--

দুর্দ্দিন।

গ্রীষ্মি যে দিন ছিল ভারী আলো আকাশ ভরা,
দিবস গুলো চুলোর সারি আগুন পোড়া কড়া,
তখন ছিল খেলার মজা আম বাগানে ছুটে,
খুন খারাবি ডালে চড়ে তলায় পড়ে লুটে,
আম কাঁঠালে ভর্‌ত পেট, জামে জিহ্বা কালো,
ফলসা বৈঁচে কোঁচড় ভরা, প্যায়রা পাকা ভালো।
এ সকল তো ছিল ভাল, মনের সাধে তবু
বন বাদাড়ে আনাগোণা হ'তনাক কভু।
রোদে খেলার মানা নিয়ে 'হরে' চলত সাথে,
ছুটলে পরে ছুটে এসে ছাতা ধর্‌ত মাথে,
মানানা মানিলে পরে গোষ্‌ষা হত ভারী,
মাষ্টারে বলিয়া দিত ফিরে গিয়ে বাড়ী।
রোদে খেলার শাসন হ'ত রোদের মত কড়া,
ঘরের কোণে একা পায়ে দাঁড়িয়ে পড়া করা।
লম্বা ছুটি সুখের হত 'স্যার' গেলে বাড়ী,
মনের সুখে হুটোপাটি নৃত্য কাড়াকাড়ি।
পুকুরে ঝাঁপাই ঝোড়া চক্ষু দুটি রাঙা,
গলার দাপটে গলা একেবারে ভাঙা!
দধি ক্ষীরে ভিজে চিড়ে মিষ্টি আম রসে
ফলার মনের মত মা'র পাশে বসে।
আরামে কাটিত দিন মাঠে বনে আর,
না ছিল পড়ার তাড়া জ্বালা নাম্‌তার!
ঘুম সে আসিত ঘরে সাঁঝ বাতি জ্বেলে,
শুতে না সাধিতে হত, ভারী লক্ষ্মী ছেলে—
ইস্কুল খুলিল ভাই, ফিরিল মাষ্টার,
সঙ্গে সঙ্গে বরষার জাগে তোল পাড়।

আকাশ আজ মেঘে ভরা, ছায়ার মেলা দেশে
টোপা টোপা বৃষ্টি পড়ে গ্রীষ্ম গেছে ভেসে !
ঘরের কোণে রয়না মন, হাওয়ার ভূতে ধরে,
ছুটে চলি তারি পিছু খোলা মাঠের 'পরে !
গুরু গুরু বাদল ডাকে, নৃত্যে নদী চলে
বিজুলি ইসারা করে কত খেলা বলে !
তাইতে চলি ঘরের ব'ার, নালার ধারে যাই,
জলের মত খেল্‌তে গিয়ে কাদায় পড়ি ভাই !
বাড়ী এসে ধোয়া মোছা, শাসন বিধিমত,
'হরে' ধরে টানে হাত মাও বকে কত !
আকাশে মেঘেরা খেলে লুকোচুরি খেলা,
বুড়ি কে হয়েছে তাই ভাবি সারা বেলা !
রোদের আপদ নাই, বৃষ্টি নাহি এলে,
এমন খেলার দিন আর নাহি মেলে।
এ দিনে ইস্কুল খোলে হায় এত আড়ি,
বড়দের সব কাজে বড় বাড়াবাড়ি !
পড়ায় লাগেনা মন, খেলা গেল ঘুচে,
ইস্কুলে চলেছি তবু চক্ষু দুটি মুছে !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভবম হাজাম।

এক যে ছিল রাজা, সে এক ভারী প্রকাণ্ড রাজা। তাঁর হাতীশালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতী গোয়ালে গোরু আস্তাবলে ঘোড়া---কি ? এ সব জান ? এ সব তো সব রাজার আছে ? তা একটু আবার শোননা--তাঁর ভাঁড়ার ভরা ইঁদুর পুকুর ভরা ব্যাং, আরো কত কিছু ছিল, আর মাথায় দুটো ছাগলের মত শিং। বেচারা রাজার ত শিং নিয়ে মহা-মুস্কিল, পাছে লোকে দেখে এই ভয়েই অস্থির। তাঁর মাথারচুল খুব লম্বা ছিল আর

তার উপর প্রকাণ্ড এক মুকুট। কোন রকম করে শিংটা চাপা দিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে বাঁচেন। কিন্তু চুল আর কত লম্বা রাখা যায়, তাতেও যে লোকে যা তা বল্‌তে আরম্ভ করে। কাজেই রাজা আর কি করেন মাঝে মাঝে চুল্ কাটান; কিন্তু যে নাপিত যায় সে সে আর ফিরে আসেনা; রাজা মশাই কোন একটা ছুতো নাতা করে তার মাথাটি উড়িয়ে দেন। কাজেই আর কোন নাপিত আস্‌তে চায়না, রাজার বাড়ি যাওয়ার হুকুম এলেই কোন রকমে খুর কাঁচি পুঁটলি পাঁটলা নিয়ে তাঁর দেশ ছেড়ে পালায়। শেষে এক ছোকরা নাপিত টাকার লোভে রাজার বাড়ি গেল। নাপিতের নাম ভবম্ হাজাম (হিন্দুস্থানি নাপিত কি না,—তারা নাপিতকে বলে হাজাম)।

ভবম্ এসে ত বেশ করে রাজার চুল কাট্‌ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে কি না রাজার মাথায়—বাপরে—এয়া বড় দুই শিং! সে ত তাই দেখে একেবারে হতভম্ব। তার পর সে কোন রকমে রাজার চুল কাটা সার্‌ল। কিন্তু বেচারার এই সব দেখে মাথা ঠিক ছিল না, সে রাজার মাথায় টিকি রাখ্‌তে ভুলে গেল। আর যায় কোথায়? রাজা বল্লেন "তবেরে বেটা বেয়াদব, আমার মাথায় শিখা রাখিস্‌নি যে? এক্ষুনি তোর গর্দ্দান নেব"।

নাপিত ত ভয়ে কাঠ। সে বল্লে "দোহাই হুজুর, এটা বড়ই ভুল হয়ে গেছে; তবে টিকি, বিশেষ করে রাজা লোকের টিকি, ও ফের খুব শিগ্‌গির গজাবে; কিন্তু হুজুর, আমি গরিব মানুষ, আমার মাথা গেলে আর গজাবে না" —কিন্তু সে আর কে শোনে? তার পর নাপিত অনেক হাতে পায়ে ধর্‌ল, শেষে বুঝিয়ে বল্ল যে তার মাথা কাটা গেলে আর কোন নাপিত কখনো রাজবাড়িতে আসবে না। তখন রাজা আর কি করেন, বল্লেন "যা, কিন্তু খবর্দ্দার আমার শিঙের কথা কাউকে বলিস্‌নে, বল্লেই তোর দফা শেষ কর্‌ব"।

নাপিত ত ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মেরে পালাল আর রাজার বাড়ির মুখোও হলনা।

এখন, নাপিতের পেটে কথা থাকে না। কাজেই এই রাজার শিংয়ের কথাও ভবম্ নাপিতের পেটে আর থাকতে চায় না। নাপিত প্রাণের দায়ে তাকে জোর জবরদস্তি করে অনেক চেপে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু সে কিছুতেই চাপা গেল না, মাঝে থেকে এই ঠেলাঠেলির চোটে ভবমের পেটটা ফুল্‌তে লাগ্‌ল। দিন যায়, নাপিতের পেটও যায় যায়।

সেটা ফুলে ফুলে ঢোল, ক্রমে ঢাকাই জালা হয়ে উঠ্‌ল। শেষে নাপিত তার এক নানির (দিদিমা) কাছে গেল। গিয়ে বল্লে "নানি, টাকার লোভে এক জায়গায় গিছ্‌লাম, সেখানে একটা কথা জেনেছি: এখন তার চোটে মাথা যায় কি পেট যায়।"

ভবম হাজাম

ENGRAVED AND PRINTED BY
U. RAY & SONS, CALCUTTA.

নানি বল্লে "কি হয়েছে খুলেই বলনা কেন? ভবম্ বল্লে "অত বলবার যো নেই আর না বল্লেও ত দেখ্‌ছ কি হচ্ছে।"

নানি তখন তাকে বলে দিল যে "সহরের মাঝে যে প্রকাণ্ড বটগাছ আছে তার কোটরে ঢুকে তোর কথাটা বলে আয়গে।" ভবম্ তখন গাছের কোটরে ঢুকে চুপে চুপে ব'লে এল "আরে বাস্‌রে, রাজার মাথায় এয়া বড় দুই শিং!!" আর অম্‌নি তার পেট ফাঁপাও সেরে গেল।

তারপর একদিন রাজার বাড়ি মহা ধূমধাম। রাজার মেয়ের বিয়ে। অনেক জায়গা থেকে কত ঢাক ঢোল কত বাজনা এসেছে। তার মধ্যে ছিল এক ঢোল সেটা সেই সহরের মাঝের বটগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। যখন বিয়ের আসর খুব জমেছে, বরযাত্রী এসে পড়েছে, চারিধারে লোকে লোকারণ্য, তখন সকলে শুন্‌ল, রাজার নহবৎখানায় শানাই কাঁসর আর ঢোল মিলে নানান্ সুরে কি যেন বল্‌ছে। শানাই তার মিহী সুরে তান ধরেছে, "রাজাকে দুই শিং! রাজাকে দুই শিং!" কাঁসর অমনি ক্যান্ ক্যান্ করে বল্‌ছে "কিন্নে কহা? কিন্নে কহা?" (কে বলেছে, কে বলেছে), আর ঢোল গুরু গম্ভীর আওয়াজ করে বল্‌ছে "ভবম্ হাজাম নে, ভবম্ হাজাম নে" (ভবম্ নাপিত বলেছে)!

আর কোথা যায়! চারিধারে হুলস্থুল—লোকে যা তা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। রাজা ত রেগে আগুন হয়ে নাপিতকে কাট্‌তে হুকুম দিলেন। কিন্তু নাপিত কি আর সেখানে থাকে? সে সেই সর্ব্বনেশে ঢোলের কাণ্ড দেখে আগেই কোথায় সরে পড়েছে। কাজেই, তাকে আর তখন ধরে কে? রাজা মশায়ের লম্ফঝম্প আর শিং নাড়াই সার হ'ল।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রকৃতির পোষমানা।

পণ্ডিতেরা বলেন যে মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে নাই, সেই অতি পুরাতন কালে পৃথিবীতে না-মানুষ না-বানর গোছের একরকম জন্তু ছিল। তাহার গায়ে তেমন অসাধারণ জোর বা কষ্ট সহিবার শক্তি কিছুই ছিল না, অথচ তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাহার জোরে আর সকল প্রাণীকে জিতিয়া সেই জন্তুই এখন ক্রমে 'মানুষ' হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বংশের সকলেই যে একেবারে মানুষ হইয়া গিয়াছে তাহা নয়, উহারই মধ্যে যাহাদের একটু বুদ্ধি খুলিয়াছিল, যাহারা ঠিকমত সুযোগ পাইয়াছিল, যাহারা চারিদিকের

বাধা বিপত্তিকে এড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছিল, তাহাদেরই ছেলেপিলের মধ্য হইতে ক্রমে মানুষ গড়িয়া উঠিয়াছে। যে বেচারারা এসব সুবিধা পায় নাই তাহাদের কেহ লোপ পাইয়াছে, কেহ বা গরিলা শিম্পাঞ্জি কেহ অসভ্য মানুষ পর্য্যন্ত হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

হাজার হাজার বৎসর আগে মানুষ যখন সবেমাত্র মানুষের মত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, যখন তাহার ঘরবাড়ী ছিল না, যখন সে রাঁধিতে শিখে নাই, সেই তখন হইতেই নানান্ জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া করা, আর সেগুলিকে নিজের কাজে লাগানর দিকে তাহার একটা ঝোঁক ছিল। এই যে পৃথিবীটার সম্বন্ধে নানারকম খোঁজ লইবার চেষ্টা এবং চারিদিকের সকল জিনিসকে ও শক্তিকে নিজের বশে আনিবার চেষ্টা, অনেকটা ইহার জোরেই মানুষ এতটা উন্নত হইয়াছে এবং পৃথিবীতে এমন সর্দ্দারি করিয়া বেড়াইতেছে।

প্রথমে যখন সে ক্ষুধার তাড়ায় বনে জঙ্গলে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইত, তখন হইতেই সে ক্রমে অস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছে, কারণ, ইহা বেশ সহজেই বুঝা যায় যে শুধু হাতে শিকার করার চাইতে হাতে একটা কিছু থাকিলে শিকার করা অনেকটা সহজ হয়। তা ছাড়া অন্যান্য জন্তুর ভয়ানক দাঁত নখ বা শিঙের মত মানুষের নিজের তেমন কোন লড়াইয়ের সরঞ্জাম ছিল না—কাজেই নিজের শক্তিটাকে ভাল করিয়া খাটাইবার জন্য তাহাকে কতকটা বাধ্য হইয়াই অস্ত্রের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। গোড়ায় হয়ত যে-কোন রকম একটা পাথরের ডেলা হইলেই তাহার কাজ চলিত, কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে, জিনিসটা একটু লম্বাটে ধরণের হইলে ঠ্যাঙাইবার সুবিধা হয়, তাহার আগাটা যদি ছুঁচালো হয় তবে সেটাকে শিকারের গায়ে বা শত্রুর ভুঁড়িতে বেশ বিঁধাইয়া দেওয়া যায়—আর তাহার আশে পাশে যদি বেশ ধার থাকে তবে ত কথাই নাই।

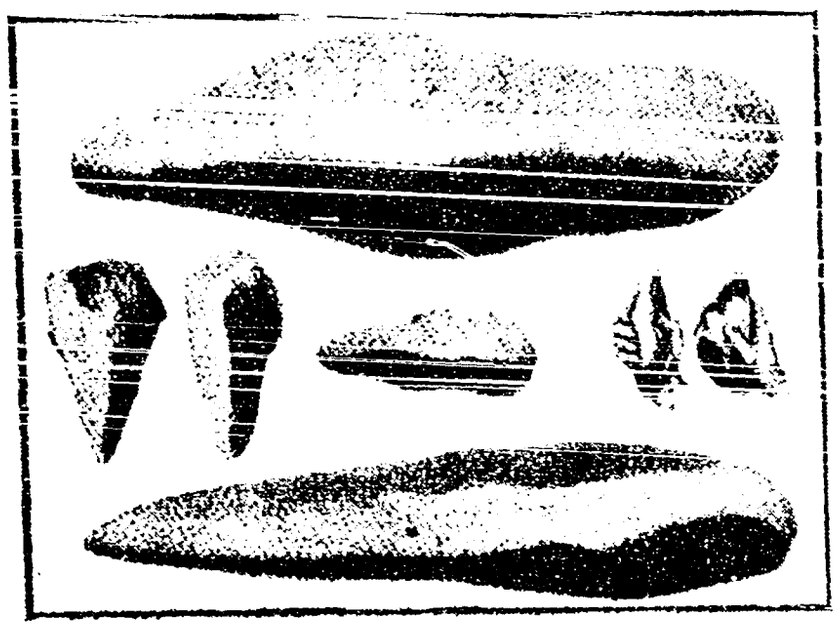

এমনি করিয়া ক্রমে কত রকম অস্ত্রই তৈয়ারি হইল, তাহাদের মারিবার ছুঁড়িবার কায়দাই বা কত রকম। আর শুধু যে ইহাতে শিকারের বা লড়াইয়ের সুবিধা হইল তাহা নয়, কত রকম কাটাকুটি ভাঙাচোরা প্রভৃতি ঘরের কাজেও এই সব অস্ত্রের ব্যবহার চলিত। এই সকল পাথরের অস্ত্রের চিহ্ন এখনও মাঝে মাঝে পাহাড়ের গুহা গহ্বরে খুঁজিলে পাওয়া যায়।

মানুষ তখনও আগুনের ব্যবহার শিখে নাই। ক্রমে যখন সে কাঠে কাঠ ঘসিয়া আগুন জ্বালাইতে শিখিল, তখন তাহার উন্নতির আর একটা পথ খুলিয়া গেল। তাহার পর ক্রমে সে অল্পে অল্পে নানারকম ধাতুর ব্যবহার শিখিল। ইহার পূর্ব্বেই সে বেশ মোটামুটি রকম বাড়ীঘর করিতে শিখিয়াছে।

ফলের বীজ মাটিতে পড়িলে তাহা হইতে ক্রমে গাছ বাহির হয় এবং সেই গাছে আবার সেই রকম ফল হয়, একথা যখন মানুষ জানিতে পারিল তখন তাহার নিজের ঘরের কাছে ভাল ভাল ফলের গাছ করিবার সখ ত তাহার হইবেই। এমনি করিয়া ফলশস্য লইয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া সে বেশ চাষবাস শিখিয়া ফেলিল। গরু পুষিতে মানুষের বড় দেরী লাগে নাই, কিন্তু ঘোড়াকে পোষ মানাইতে আরও অনেক সময় লাগিয়াছিল।

ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, আগুন এই সব শক্তির কাণ্ড দেখিয়া মানুষ এক সময়ে খুবই অবাক্ হইত, হয়ত ভয়ও পাইত। তখন, কিরূপে এই সকলের উপদ্রব হইতে আপনাকে বাঁচান যায় এই ভাবনায় সে ব্যস্ত হইত, কিন্তু এখন তাহার সে ভয় ভাঙিয়া গিয়াছে---সে এখন শক্তিগুলিকে ধরিয়া বাঁধিয়া আপনার কাজ সারাইয়া লইতে চায়। সে ভাবে, গরু, ঘোড়া, কুকুর যেমন আমার কাজে লাগিয়াছে, তেমনি এগুলিকেও যদি বাগ মানাইতে পারি, তবে ইহাদের নিকট হইতেও ঢের কাজ পাওয়া যায়। যেমন মনে কর আগুন। অনেক কাল ধরিয়া মানুষ আলোর জন্য, রাঁধিবার জন্য, শীত নিবারণের জন্য, ও নানারকম মাটির ও ধাতুর জিনিস পত্র গড়িবার জন্য আগুন ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও সে সন্তুষ্ট থাকে নাই। আগুনের উপর জল গরম করিতে গিয়া বুদ্ধিমান মানুষ দেখিল, জলটা যখন টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে তখন তাহার বাষ্পটাকে আটকাইয়া রাখা যায় না। তখন সে ভাবিল, 'তাই ত, বাষ্পের এত জোর? লাগাও উহাকে কল চালাইবার কাজে।' এমনি করিয়া ইঞ্জিন খাড়া হইল। এখন সে ইঞ্জিনের যে কত রকম উন্নতি হইয়াছে, আর তাহার দ্বারা মানুষ যে কত রকম কাজ করাইয়া লইতেছে তাহা বলিতে গেলে প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া দাঁড়ায়।

বাতাসকে কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে হয়, একটা পালওয়ালা নৌকার দিকে তাকাইলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। অনেক জায়গায় একরকম হাওয়ার কল (Windmill) আছে, তাহা বাতাসের জোরে চলে। এইরূপ কলের সাহায্যে জল তোলা, ময়দা পেষা ইত্যাদি কত কাজই করাইয়া লওয়া হয়। এমনি করিয়া পবনদেব আট্‌কা পড়িয়া বেগার খাটিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এইরূপে জলের স্রোত, ঝরণার বেগ, সূর্য্যের উত্তাপ সকলকেই মানুষ নিজের কাজের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে চায়। এক একটা বড় ঝরণায় প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ মণ জল দশবিশ তলা বাড়ীর সমান উঁচু হইতে লাফাইয়া পড়িতেছে, তাহার গর্জ্জন আর তাণ্ডব-নৃত্য মিলিয়া সমুদ্রমন্থনের মত একটা কাণ্ড উপস্থিত হয়—তাহা দেখিয়া মানুষের মনটা যেন খুঁৎখুঁৎ করিতে থাকে। সে ভাবে, "এতগুলা জল খামখা নষ্ট হয় কেন? ইহার সঙ্গে আমার কলের চাকা জুড়িয়া দিলেই ত আমার বাতিজ্বালান, কলচালান, পাখাটানা, গাড়ীঠেলা কত কাজের সুবিধা করিয়া লইতে পারি।" ঝরণার জল এতদিন নিজের আনন্দেই খেলিয়া বেড়াইত, মানুষ এখন তাহাকে নিজের ঘানির সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে।

আকাশে বিদ্যুতের কাণ্ড মানুষ বহুকাল ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে। বালক ফ্রাঙ্ক্‌লিন যেদিন ঘুড়ি উড়াইয়া সেই বিদ্যুতের ক্ষীণ ঝিকিমিকিটুকু হাতের কাছে ধরিয়া আনিলেন, বিদ্যুৎও সেইদিন হইতে প্রমাদ গণিতেছেন। বিদ্যুতের খোঁজ করিতে গিয়া মানুষ দেখিল, বিদ্যুৎ কেবল আকাশে থাকেনা, চারিদিকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জিনিসের মধ্যেই বিদ্যুৎ লুকাইয়া থাকে। মানুষ সেই বিদ্যুৎকে জাগাইয়া তুলিবার ও নানাকাজে

খাটাইয়া লইবার সঙ্কেত বুঝিয়াছে, এবং এক জায়গায় বিদ্যুৎ সঞ্চয় করিয়া তারের সাহায্যে তাহাকে নানাদিকে চালাইয়া কত কাজই করাইয়া লইতেছে। কিন্তু এখনই কি মানুষ সন্তুষ্ট হইয়াছে? এখন মানুষ আকাশে উড়িতে চায়, অদ্ভুতরকম নৌকা বানাইয়া

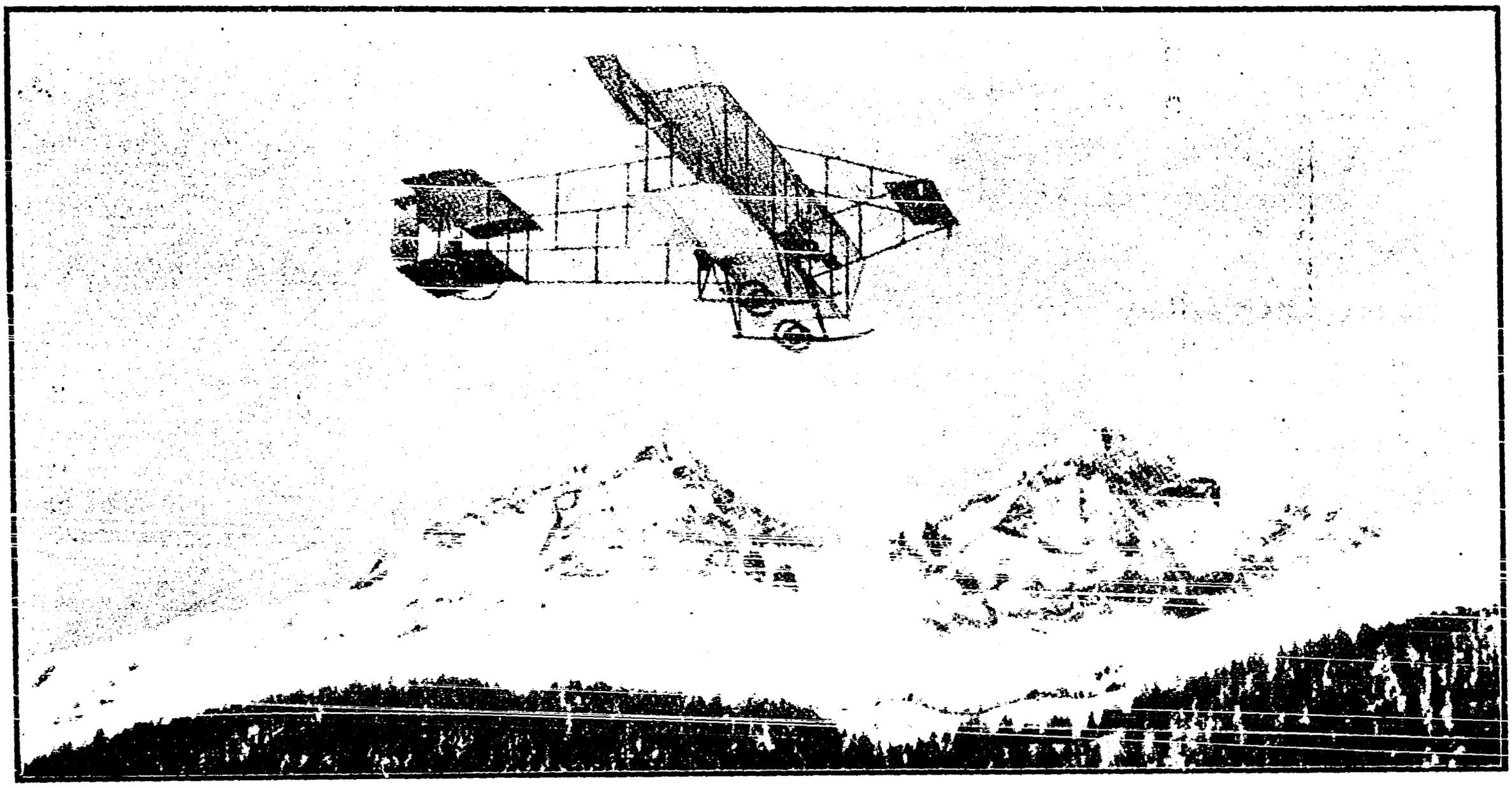

জলের নীচে ঘুরিতে চায় আরও নূতন সূক্ষ্ম শক্তি সকলের খোঁজ করিতে চায় —পারিলে, সে হয়ত একবার পৃথিবীর বাহিরে গ্রহনক্ষত্রে বেড়াইয়া আসে।

বনের খবর।

যারা জরীপের কাজ করে, তাদের অনেককে ভারী ভয়ঙ্কর সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। সে সব জায়গায় হাতী, মোষ, বাঘ, ভালুক আর গণ্ডার চলা ফেরা করে; যেখানে সে সব নাই, সেখানে তাদের চেয়েও ভয়ানক মানুষ থাকে। প্রায় চৌদ্দ বছর এ সকল জায়গায় থেকে, কত ভয়ই পেয়েছি কত তামাসাই দেখেছি। তার কথা তোমাদের কিছু কিছু বল্‌ব।

সরকারী জরীপের কাজে অনেক লোককে দলে দলে নানান্ জায়গায় যেতে হয়। এক এক জন কর্ম্মচারীর উপর এক এক দলের ভার পড়ে; তার সঙ্গে জিনিস পত্র, গরু, ঘোড়া, খচ্চর, খালাসী, সার্ভেয়ার, চাকর বাকর বিস্তর থাকে। থাক্‌তে হয় তাঁবুতে। লোক জনের

বাড়ীর কাছে থাকা প্রায়ই ঘটে না, আবার সময় সময় ঘটেও। এক-এক সময় এমন হয় যে, কুড়ি পঁচিশ মাইলের ভিতরে আর মানুষ নাই। বন এমনি ঘন আর অন্ধকার যে, তার ভিতর দিয়ে চলবার পথ গাছ কেটে তয়ের করে নিয়ে তবে এগুতে হয়। জানোয়ার চলবার পথ যদি পাওয়া যায়, সেটা সুবিধার কথা বল্‌তে হবে।

এমনি ত জায়গা। প্রথমে সে সব জায়গায় গিয়ে একটু সহজেই ভয় হত। আমার মনে আছে, একদিন রাত্রে আমার তাঁবুর সামনে বসে ফোঁস্ ফোঁস্ করে একটা বাঘ নিশ্বাস ফেল্‌ছিল, আমি তা শুনে ভারি ব্যস্ত হয়েছিলাম। তারপর এর চেয়ে কত বড় বড় ঘটনায় পড়েছি, তাতে তেমন ব্যস্ত হইনি! সেই সব ঘটনার কথাই তোমাদের বল্‌তে এসেছি; আশা করি, তোমরা শুনে আমোদ পাবে। আজ তবে আমার সঙ্গের এক বুড়ো সার্ভেয়ারের দুই চাকরের কথা বলি।

সার্ভেয়ারটি ব্রাহ্মণ; বাড়ী অযোধ্যায়। চাকর দুটি তারই দেশের লোক,—সুচিৎ আর বেণী। তারাও দুজনেই ব্রাহ্মণ। বেণী বুড়ো, বেঁটে, রোগা, কালো আর হিংসায় তার পেটটি ভরা। সুচিৎ লম্বা, মোটা, ফরসা আর সাদা সিদে মানুষ। দুজনে মিলে সেই সার্ভেয়ারটির রান্না বান্না, কাজ কর্ম্ম সব করে। সার্ভেয়ার তাদের দুজনকেই খেতে দেয়, কিন্তু বেণীর তা সহ্য হয় না। সুচিৎ কেন বাবুর খাবে? আর খাবে যদি, তবে অত খাবে কেন? সুচিতের শরীরটি যেমন, আহারটিও তেমনি—সে বেণীর ডবল খায়। কাজও করে সে বেণীর চেয়ে বেশী; কিন্তু তা হলে কি হয়? বাবু যে সুচিৎকে খেতে দেয়, বেণী তা সইতে পারে না। সুচিৎও যতটা খায়, সব সময় তা হজম কর্‌তে পারে না, তাইতে তাকে কাজ কর্‌তে কর্‌তে অনেক সময় ঘটি হাতে ছুট্‌তে হয়। সেদিন সন্ধ্যা বেলায় বাবুর চায়ের জল গরম কর্‌তে গিয়েও তাকে তেম্‌নি ছুট্‌তে হল।

চারিদিকে ঘোর জঙ্গল, বাঘের ভয় খুবই আছে, কাজেই সুচিৎ বেশী দূরে যায় নি। অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে দেখে খচ্চরওয়ালারা খচ্চর সব বেঁধে চারদিকে ধুনি জ্বালাবার যোগাড় কর্‌ছে। এমন সময় তাদের একজন দেখ্‌ল, ওরে বাবারে! কি বড় বাঘ আস্‌ছে, গুড়ি মেরে! এ

ঝোপ থেকে ও ঝোপের আড়ালে, সেখান থেকে আরেক ঝোপের পিছনে, এমনি করে ঠিক সুচিৎকে গিয়ে ধর্‌বার চেষ্টা। দেখেই ত সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "পালাও, পালাও! বাঘ এসেছে, ধর্‌লে!" সে কথা শুনবামাত্র সুচিৎ যে কি রকম প্রাণপণে ছুটে ছিল, বুঝ্‌তেই

পার। কোথায় বা রৈল তার লোটা, কোথায় বা রৈল তার জল ; সে দুই লাফে একেবারে তাঁবুর ভিতরে এসে হাজির। ভয়ে বেচারার প্রাণ শুকিয়ে গেছে ; মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্চে না। বাবুর চা সে রাত্রে উনুনের উপরেই রইল,বাঘেরও সুচিৎকে না খেয়েই ফিরে যেতে হল। তার অনেক পরে চার পাঁচজন মিলে মশাল নিয়ে সুচিৎকে নদী থেকে স্নান করিয়ে আন্‌ল। সেই পৌষ মাসের শীতে বেচারা কি কষ্টই পেলে। তা দেখে কিন্তু বেণীর মুখে হাসি আর ধরে না।

বেণীরও যে সকল দিন এমনি হেসেই কেটেছিল তা নয়। এমনি আর এক জঙ্গলে ঐ সার্ভেয়ারের তাঁবু পড়েছে। বেণী এখন রান্না করে। তাকে তাঁবুতে রেখে সার্ভেয়ার অন্য লোকদের নিয়ে কাজে চলে গিয়েছিল ; খেটে খুটে কাহীল হয়ে সন্ধ্যা বেলা ফিরে আস্‌তে আস্‌তে সে ভাব্‌ছে, তাঁবুতে এসেই রান্না তৈরী পাবে, আর হাত পা ধুয়ে খেয়ে দিব্যি ঘুমটি দেবে। তাঁবুতে এসে কিন্তু দেখে, রান্না কর্‌বে কে, বেণী তাঁবুতেই নাই। এদিক ওদিক চারদিক খুঁজে তাদের বড় ভাবনা হল, বুঝি বেণীকে বাঘে নিয়ে গেছে। সঙ্গের শান কুলিরা কিন্তু সব-দিক ভাল করে দেখে বল্লে যে, বাঘ ওদিক পানে আসে নি,—বাঘের কোন চিহ্নই নাই।

তখন সবাই মিলে খুব চেঁচিয়ে বেণীকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। অনেক ডাকাডাকির পর খানিক দূর থেকে ভাঙ্গা গলায় উত্তর এলো, "আমি এখানে!" সকলে আলো নিয়ে সেই দিক পানে ছুট্‌ল। সেখানেও তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে আবার ডাক্‌তে লাগ্‌ল। তখন গাছের উপর থেকে বেণী বল্লে, "আমি গাছে, নাম্‌তে পার্‌ছিনা!" তা শুনে শানেরা তাড়াতাড়ি গাছে উঠে দেখে, বেণী তার পাগড়ি খুলে তাই দিয়ে নিজেকে বেশ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে বসে আছে! সেইখান থেকে তার বাঁধন খুলে তাকে নামিয়ে আনা হল।

বেচারা অনেক কষ্ট করে গাছে উঠেছিল। গায়ের অনেক জায়গা ছড়ে গিয়েছে, কাঁটার খোঁচাও নিতান্ত কম খায়নি। সবাই জিজ্ঞাসা কর্‌লে "তোর এমন দশা কি করে হল রে?" বেণী বড় বড় চোখ করে বল্লে, "বা-া-া-ঘ এসেছিল! নালার ধারে এসে এমনি গড়্‌গড়িয়ে উঠ্‌লো যে আমি তখনি ছুটে চলে এলাম ; তাতেই গা ছড়ে গিয়েছে আর কাঁটার খোঁচা লেগেছে।

বাঘটা আবার ডাক্‌তে ডাক্‌তে উপরে উঠে আস্‌তে লাগল, কাজেই আমিও গাছে উঠে গেলাম। কি করে যে উঠ্‌লাম, জানি না, আর কখ্‌খনো গাছে উঠিনি। উঠেই পাগড়ি খুলে ডালের সঙ্গে জড়িয়ে নিজেকে বেঁধে নিয়েছিলাম; তারপর শীতে হাত পা অবশ হয়ে গেছে, নাম্‌তে গিয়ে আর নাম্‌তে পারিনি।" শীতে অবশ হওয়ার কথাই বটে, সেটা ছিল জানুয়ারি মাস।

শানেরা কিন্তু বল্লে, "বাঘ এসেছিল, আর তার পায়ের দাগ নেই, তা কি হতে পারে?" বেণী তাতে ভারী চটে বল্লে, "ব্যাটাদের চোখ নেই, তাই বল্‌ছে বাঘ আসেনি। রাত্রে এসে যখন ধর্‌বে, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে!" বল্‌তে বল্‌তেই নালার ধারে গম্ গম্ করে একটা শব্দ হল, আর বেণীও অমনি একেবারে লাফিয়ে উঠে বল্লে, "ঐ শোন, বাঘ এসেছে কিনা!" তা শুনে সকলে ত হেসে গড়াগড়ি। সেটা ছিল একটা হরিণ (barking deer)!

শেষে আমি এলে পরে আমাকে যখন সার্ভেয়ার সব বল্লে, তখন আমি বেণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "বেণী, তুমি পশ্চিমের লোক, সিপাহীর জাত হয়ে, একটা হরিণের ডাক শুনে অমন কর্‌লে?" তাতে সে বল্লে, "হুজুর, দিনের বেলায় ওটা বাঘই ছিল। রাত্রে আমার ভুল হয়েছিল। তখন মেজাজটা ঠিক ছিল না, তাই বুঝ্‌তে পারিনি।"

যা হোক, বেণীর বাঘের কথা নিয়ে সকলে মিলে তাকে কিরকম ক্ষেপিয়েছিল, তা বোধ করি আমি বলে না বুঝালেও চল্‌বে।

ক্রমশঃ।

ধাঁধাঁ।

(১) একটি চারকোণা পুকুরের চারটি কোণায় চারটি ছোট ঘর ছিল। কিছুদিন পর পুকুরটি বড় করার আবশ্যক হইল। একজন লোক পুকুরটিকে কাটিয়া অনেক বড় করিল, অথচ পুকুরটি ঠিক চতুষ্কোণই রহিল এবং ঘরগুলিকে একটু ও নরান হইল না। বলতো, কিরূপে সে এই কাজ করিল?

(২) একটি বাবু বাগানে লাগাইবার জন্য ১৬টি গাছ আনিয়া মালিকে বলিলেন, "বাগানের এক এক ধারে চারটি করিয়া গাছ সারি দিয়া লাগাইতে হইবে।" মালি ৪টি গাছ চুরি করিল, অথচ এক এক ধারে চারটি করিয়াই গাছ লাগাইল। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

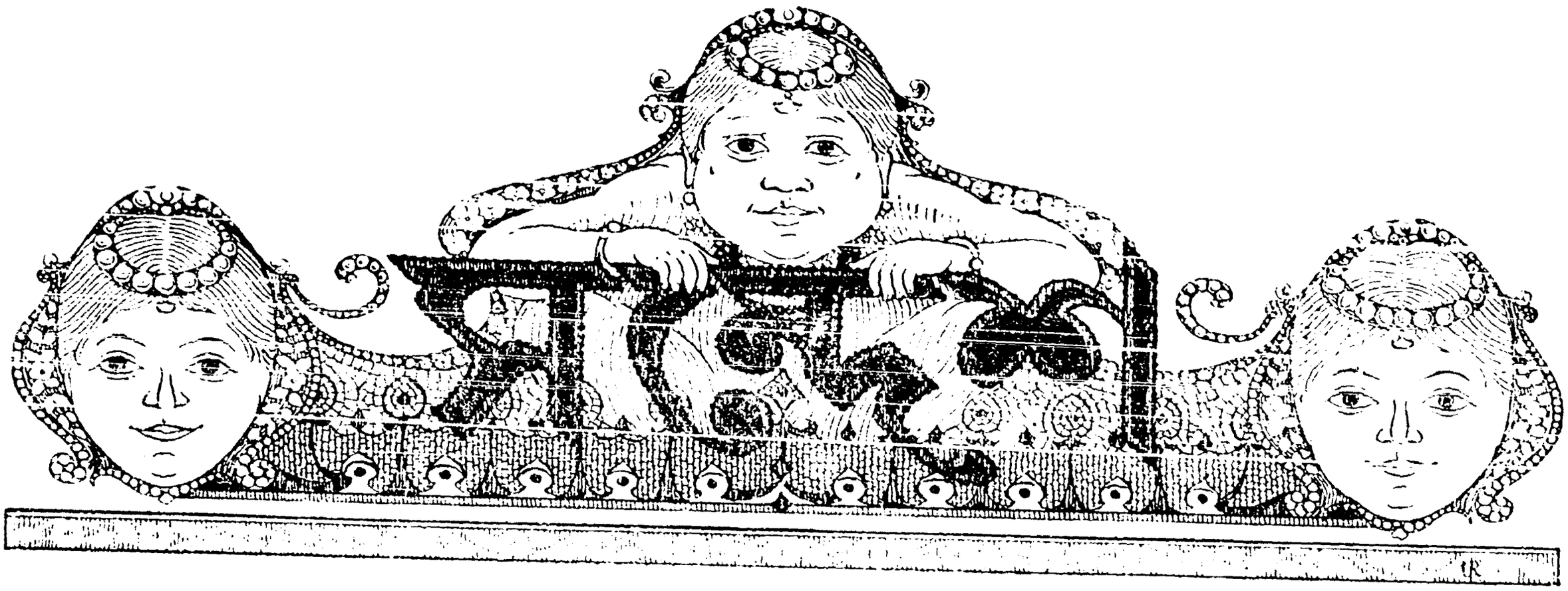

প্রথম বর্ষ　　চৈত্র, ১৩২০　　দ্বাদশ সংখ্যা

সকালে ও সাঁঝে।

যাঁহার প্রভায় সূর্য্য ওঠে
　　নীল আকাশের কোলে,
শিশির ফোঁটা হীরের মত
　　লতায় পাতায় জ্বলে ;
মেঘের শিরে সিঁদুঁর ছটা,
　　পাখীর গলায় গান,
কানন ভরা কুসুম রাশি
　　জুড়ায় মন প্রাণ,
ধীর পবনের বক্ষে ভাসে
　　মধুর সুবাস তার,
ধরার বুকে থাকেনা আর
　　দুঃখ হাহাকার ;
যাঁহার প্রভায় সন্ধ্যা আসে
　　দিনটি কেটে গেলে,
কিরণ গুলি কুড়িয়ে রবি
　　কোন দেশে যায় চলে ;

মধুর হেসে ওঠে চাঁদ!
ছড়িয়ে কোমল কর,
ফুলের বনে খেলে কিবা
কিরণ মনোহর ;
দূর কাননের কুঞ্জ মাঝে
কোকিল ঘুমায় সুখে,
আঁধার মাখা আঁচল খানি
নামে ধরার বুকে,
তাঁরি শরণ লয়ে সবাই
হব সফল কাম,
সকাল সাঁঝে সকল কাজে
লব তাঁরি নাম।

—শ্রীমতী লাবণ্যলতা চৌধুরী।

ওয়াসিলিসা।

ওয়াসিলিসা এক সওদাগরের মেয়ে। তার মা ছিল না, কেউ ছিল না,—ছিল খালি এক দুষ্টু সৎমা ; আর ছিল সেই সৎমার দুটো ডাইনীর মত মেয়ে।

ওয়াসিলিসার মা যখন মারা যান, তখন তিনি তাকে একটা কাঠের পুতুল দিয়ে ছিলেন আর ব'লেছিলেন, "একে কখন ছেড়ো না, সর্ব্বদা কাছে কাছে রেখো, আর যখন তোমার বিপদ-আপদ ঘট্‌বে একে চারটি কিছু খেতে দিও। তবেই দেখ্‌বে, এ মানুষের মত তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বে ; তখন এর পরামর্শ মত চ'লো।" তার পরে এতদিনে ওয়াসিলিসা বড় হ'য়ে উঠেছে।

সৎমা তার মেয়েদের সঙ্গে মিলে কেবল ওয়াসিলিসার অনিষ্ট চেষ্টা কর্‌ত। ওয়াশিলিসা দেখ্‌তে যেমন সুন্দর, তার কথাবার্ত্তা তেম্‌নি মিষ্টি। গ্রামের যত লোক সবাই তাকে ভালবাসে—আর সেই সৎমাটার যে দুটো মেয়ে—তাদের দাঁত যেমন উঁচু, চোখ তেম্‌নি টেরা, নাক তার চেয়েও বাঁকা,—আর তার উপরে তারা এম্‌নি দুষ্টু আর হিংসুকে আর ঝগ্‌ড়াটে, তাদের কে ভাল বাস্‌বে? তাই তারা হিংসায় ওয়াসিলিয়াকে ধ'রে মার্‌ত। গ্রামের এক কিনারায় ওয়াসিলিসাদের বাড়ী আর বাড়ীর পাশেই প্রকাণ্ড বন।

সেই বনের মধ্যে সবুজ মাঠের উপরে ডাইনীবুড়ী বাবায়াগার বাড়ী। সে বুড়ী মানুষ খায়, সব খায়,—সুন্দর মেয়েদের ধর্‌তে পেলে ত খুব উৎসাহ ক'রেই খায়।

একদিন রাত্রে দুষ্টু সৎমা তার মেয়েদের বল্‌ল "এক কাজ কর্‌। ঘরের আগুণটা নিবিয়ে দেত। তাহ'লেই ওয়াসিলিসাকে আবার আগুণ আন্‌বার জন্য সেই সবুজ মাঠে বাবায়াগার বাড়ীতে পাঠান যাবে; আর বাবায়াগা তাকে ধ'রে গিলে ফেল্‌বে। কেমন মজা!" যেই একথা বলা, অমনি বড় মেয়েটা উঠে ইচ্ছে ক'রে ছাই মাটি চাপা দিয়ে আগুণ নিবিয়ে দিল। আর সকলে চেঁচাতে লাগ্‌ল "ঐ যা! আগুণ ত নিবে গেল। ওয়াসিলিসা, ওয়াসিলিসা, শীগ্‌গির ওঠ। বনের মধ্যে সবুজ মাঠ আছে, তার মধ্যে বাবায়াগার বাড়ী, তার বাড়ীর আগুণ নাকি কখনও নিবে যায় না। শীগ্‌গির যাও দৌড়ে যাও, সেই আগুণ খানিকটা নিয়ে এস।"

এই না বলে তারা ওয়াসিলিসার চুল ধ'রে হিড়্‌ হিড়্‌ ক'রে টেনে তাকে বাড়ীর বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে, ঘরের খিল এঁটে দিল। ওয়াসিলিসা বাইরে ব'সে কাঁদ্‌ছে, এমন সময় তার সেই ছোট কাঠের পুতুলের কথা মনে হ'ল। তখন সে তাড়াতাড়ি তার কাপড়ের মধ্যে থেকে পুতুলটাকে বের ক'রে তার মুখে একটু খাবার দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল "কাঠের পুতুল খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" অম্‌নি কাঠের পুতুলের চোখ দুটো জলে উঠ্‌ল, ঠোঁট দুটো ন'ড়ে উঠ্‌ল—তার পর সে বল্‌তে লাগ্‌ল—

"কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়, ওয়াসিলিসার কিসের ভয়?
তুমি ভয় পেওনা, বাবায়াগার বাড়ী সোজা চ'লে যাও।"

ওয়াসিলিসা চল্‌তে লাগ্‌ল। রাত গেল, সকাল গেল, দুপুর গেল—তখন দেখা গেল সবুজ মাঠ তার ঠিক মধ্যখানে ভাঙ্গাচোরা সাদা বাড়ী, তার গায়ে সারি সারি মড়ার খুলি, তার দরজা জানালা ফটক কবাট সব আস্ত আস্ত হাড়ের তৈরী। হুড়্‌কো কব্জা কাঁটা পেরেক কোথাও কিছু নেই—কিছু দিয়ে বাঁধা নেই জোড়া নেই অথচ বাড়ীখানা চারটে পাখির ঠ্যাঙের উপর ঠিক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওয়াসিলিসা অবাক হ'য়ে দেখ্‌ছে এমন সময় হঠাৎ একটা সাদা লোক ঝক্‌ঝকে সাদা পোষাক পরে সাদা ঘোড়ায় চ'ড়ে সাঁই সাঁই ক'রে কোথা থেকে ছুটে এল। এসেই, সোজা বাড়ীর ফটকের উপর ছুটে পড়্‌ল আর ধাঁ ক'রে বাড়ীর সঙ্গে মিশে গেল। ওয়াসিলিসা চেয়ে দেখ্‌ল তখন বিকেল হ'য়ে এসেছে, রোদ প'ড়ে আস্‌ছে।"

তারপর একজন লোক এল, রাঙা সূর্য্যের মত লাল তার রং—তার পোষাক তার ঘোড়া, সবই লাল। সেও তেম্‌নি ছুটে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে মিশে গেল। ওয়াসিলিসা দেখ্‌ল সন্ধ্যে হ'য়েছে, চারদিক অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে।

তারপর একজন এ'ল অন্ধকারের মত কালো—কালো পোষাক, কালো ঘোড়া। সে যাই বাড়ীর মধ্যে মিশে গেল আর চারদিক ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। কেবল সেই বাড়ীর গায়ে মড়ার খুলি গুলো আপনা থেকে ঝক্‌ ঝক্‌ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল—আর দাঁত বের ক'রে চারদিকে আলো ছড়াতে লাগ্‌ল।

তার পরে একটা প্রকাণ্ড হামানদিস্তা হাঁকিয়ে বাবায়াগা নিজে এসে হাজির। সে এসেই ত ওয়াসিলিসার গন্ধ পেয়ে তাকে ধ'রে নিয়ে গেল। ওয়াসিলিসা আগুণ নিতে এসেছে শুনেই সে বল্‌ল, "বটে! আগুণের বুঝি দাম লাগে না? তিন দিন আমার বাড়ীতে কাজ কর্‌—যদি ভাল কাজ কর্‌তে পারিস্‌ আগুণ পাবি; আর, তা যদি না পারিস্‌ তোকে আমি ঝোল রেঁধে খাব। "আচ্ছা, এখন আমার খাবার গুলো উনুন থেকে নামিয়ে আমায় দেত!" ওয়াসিলিসা খাবার এনে দিল। বুড়ী চেটেপুটে খেয়ে বল্ল "কাল সকালে আমি বেরিয়ে যাব। সন্ধ্যার সময় এসে যেন দেখ্‌তে পাই—আমার ঘর ঝাঁট দেওয়া হয়েছে, আমার রান্না ঠিকমত করা হ'য়েছে,—আর ঐ কোণে এক ঝুড়ি সোণার ধান দেখ্‌বি তার মধ্যে অনেক কাঁকর, অনেক খুদ, আর তার চাইতেও বেশী কাল ধান মেশান আছে—সমস্ত ঝেড়ে বেছে রাখিস্‌। খবর্দ্দার, কিছু ভুল হয় না যেন।"

ওয়াসিলিসা ব'সে ব'সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তখন তার কাঠের পুতুলের কথা মনে হ'ল। সে পুতুলের মুখে একটু খাবার দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "কাঠের পুতুল খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" কাঠের পুতুলের চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌ল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠ্‌ল, সে বল্‌তে লাগ্‌ল—

"কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়, ওয়াসিলিসার কিসের ভয়!
তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও গিয়ে।"

ওয়াসিলিসা ঘুমাতে গেল। সকাল বেলায় বাবায়াগা তার হামানদিস্তায় চ'ড়ে বেরিয়ে গেল।—আর, কি আশ্চর্য্য! ঘরদোর সব আপনা থেকে ঝাঁট হ'য়ে গেল। খাবার গুলো উনুনে চ'ড়ে আপনা থেকে সিদ্ধ হ'তে লাগ্‌ল। ওয়াসিলিসা অবাক হ'য়ে সেই ধানগুলো দেখ্‌তে গিয়ে দেখে তার কাঠের পুতুল সমস্ত ধান বেছে সোণার ধান কালো ধান কাঁকর আর খুদ সব আল্‌গা ক'রে ফেলেছে!

বিকেলবেলা সাদা লোকটা ফিরে এল, সন্ধ্যার সময় লাল লোকটা ফিরে এল আর

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রে কাল লোকটা ফিরে এল,—তার পর ঝম্‌ ঝম্‌ খট্‌খটাং ক'রে হামানদিস্তা হাঁকিয়ে বাবায়াগা ঘরে এল। এসেই সে হামানদিস্তার বাঁটটা দিয়ে ঘরের সব জায়গায় ধাঁই ধাঁই ক'রে মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কোনখান থেকে ধুলো পড়ে কি না! তার পর যখন সে দেখ্‌ল ঝাঁট দেওয়াও ঠিক হ'য়েছে, খাবার ও রান্না হ'য়েছে, ধানও বাছা হ'য়েছে, তখন সে রেগে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগল "হতভাগী মেয়ে, কে তোকে বাঁচিয়েছে—শীগ্‌গির আমায় বল্‌।" ওয়াসিলিসা ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌ল "আমার মা মারা যাবার সময় আমায় যা আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, তাতেই আমি বেঁচেছি।" এই না শুনে ডাইনীবুড়ী ভয়ে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল "ওরে বাবা রে! কার আশীর্ব্বাদ নিয়ে আমার বাড়ী এসেছে রে! আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে রে! এই নে তোর আগুণ নে,—আমার বাড়ী থেকে শীগ্‌গির বেরো। এই বলে সে ওয়াসিলিসাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল, আর একটী মড়ার খুলি তাকে ছুঁড়ে দিল।

ওয়াসিলিসা একটা লাঠির আগায় খুলিটাকে চড়িয়ে বাড়ী নিয়ে গেল। কিন্তু বাড়ীতে

নিলে কি হবে? তার যে সেই সৎমা আর তার দুটো দুষ্টু মেয়ে, তাদের ত কেউ কোন দিন আশীর্ব্বাদ করে নি—তারা মহা খুসী হ'য়ে যেই আগুণটা নিতে গিয়েছে অম্‌নি তাদের গায়ে আগুণ ধ'রে গিয়ে তারা ত মর্‌লই, বাড়ীঘর সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

ওয়াসিলিসা আবার ব'সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তখন তার কাঠের পুতুলের কথা মনে হল। পুতুলের মুখে খাবার দিয়ে বল্‌ল "কাঠের পুতুল খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" কাঠের পুতুল জেগে উঠে বল্‌ল—

"কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়—ওয়াসিলিসার কিসের ভয়!
তুমি রাজার কাছে যাও তিনি তোমায় সুখী কর্‌বেন।"

ওয়াসিলিসা তখন রাজার বাড়ী চ'ল্লেন। এমন সুন্দর মেয়ে, এমন মিষ্টি কথা বলে, কেউ তাকে বারণ কর্‌ল না, কেউ বাধা দিল না—ওয়াসিলিসা একেবারে রাজসভায় রাজার সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত!

রাজা এমন চমৎকার মেয়ে কখন কোথাও দেখেন নি—তিনি তার কথা শুন্‌বেন কি—তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে উঠে পড়্‌লেন, বল্লেন "আহা কি সুন্দর মেয়েটি গো! তুমি কার মেয়ে? কি তোমার দুঃখ? তুমি আমায় বিয়ে কর—আমার রাজ্যের রাণী হ'য়ে থাক আমি তোমার সব দুঃখ দূর কর্‌ব।"

এম্‌নি ক'রে ওয়াসিলিসা রাণী হলেন।—আর সেই কাঠের পুতুল সোণার খাটে, মখ্‌মলের গদিতে, রেশমের চাদরের উপর ঝক্‌ঝকে পোষাক প'রে শুয়ে থাক্‌ত।

গঙ্গা আনিবার কথা।

সগর গঙ্গা আনিতে পারেন নাই। অংশুমানও পারেন নাই। অংশুমানের পুত্র দিলীপ খুবই বড় রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনিও গঙ্গা আনিতে পারেন নাই।

দিলীপের পরে রাজা হইলেন তাঁহার পুত্র ভগীরথ। তিনি যেমন ধার্ম্মিক ছিলেন, তপস্যাও করিয়াছিলেন তেমনি আশ্চর্য্য। চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া, তাহার মাঝখানে বসিয়া তিনি হাত তুলিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। হাজার বৎসরের মধ্যে আর সে হাত নামান নাই, এই সময়ের মধ্যে মাসে শুধু একটিবারের বেশী খানও নাই।

হাজার বৎসর এমনি ভাবে চলিয়া গেল। তাহার পরে ব্রহ্মা দেবতাগণকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভগীরথ! আমি তোমার তপস্যায় বড়ই তুষ্ট হইয়াছি। তুমি কি চাহ?"

ভগীরথ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, যোড়হাতে বলিলেন, "প্রভু! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া আমাকে গঙ্গা আনিবার উপায় করিয়া দিন।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, আমি তাহাই করিয়া দিতেছি। এই যে আমাদের সঙ্গে এই দেবতাটি দেখিতেছ, ইনিই গঙ্গা, হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইনি তোমার কাজ করিতে পৃথিবীতে যাইবেন। কিন্তু এক কথা,—ইনি যদি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে লাফাইয়া পড়েন, তবে পৃথিবী ত তাহার চোট সামলাইতে পারিবে না। সে ভয়ঙ্কর চোট খালি একজনে সহিতে পারেন, তিনি হচ্ছেন শিব। সুতরাং তুমি আগে গিয়া শিবকে সেই কাজটি করিতে রাজী করাও, তবেই গঙ্গা পৃথিবীতে নামিতে পারেন।"

তখন ভগীরথ কেবল মাত্র পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর দাঁড়াইয়া এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত শিবের স্তব করিলেন। সে স্তব শুনিয়া আর মহাদেব না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আসিয়াই তিনি মাথা পাতিয়া দাঁড়াইলেন, এখন গঙ্গা নামিলেই হয়।

এদিকে গঙ্গা ভাবিতেছেন, "দাঁড়াও, এই বুড়োকে ভাসাইয়া পাতালে লইয়া যাইব।" এ কথা যে মহাদেব টের পাইবেন, সে খেয়াল গঙ্গার ছিল না, আর সেই বুড়ার যে কতখানি ক্ষমতা তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন শিবকে নাকাল করিবেন, তাহার বদলে নিজেই নাকালের একশেষ। শিবকে ভাসাইয়া নেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার জটার ভিতরে পড়িয়া আর তিনি বাহির হইবার পথ পান না। সে জটা এখন হিমালয়ের মত বিশাল হইয়া গিয়াছে, তাহার গলি ঘুচির ভিতরে গঙ্গাদেবী মা হারা খুকীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

বৎসরের পর বৎসর যায়, গঙ্গা তবুও সেই সর্ব্বনেশে জটার ভিতর হইতে বাহির হইতে পারেন না। ভাগ্যিস ভগীরথ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আবার প্রাণপণে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, নইলে আরো কত দিন গঙ্গাকে সেখানে থাকিতে হইত কে জানে। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিলেন, গঙ্গাও তখন সপ্তধারা হইয়া সাত দিকে বহিয়া চলিলেন।

তখন অবশ্য খুবই একটা তুমুল ব্যাপার হইয়াছিল, আর সকলেই ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসিয়াছিল। এত জল, এত ফেণার এমন নৃত্য আর কখনও দেখা যায় নাই,

এমন ডাক ও কেহ কখনো শুনে নাই। মাছ, কুমীর, কচ্ছপ, শুশুক আর সাপে পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছিল।

গঙ্গা সাতটি ধারায় বহিয়া সাতদিকে ছুটিলেন; তাহার একটি ধারা ভগীরথের রথের পিছু পিছু যাইতে লাগিল। যত দেবতা, যত দানব, যত মুনি ঋষি যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব পিশাচ কিন্নর, সকলেই সেই রথের পিছু পিছু গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

সেই পথের ধারে ছিল জহ্নু মুনির আশ্রম। মুনি যজ্ঞ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় গঙ্গার জল সোঁ সোঁ শব্দে আসিয়া তাঁহার সকল আয়োজন ভাসাইয়া নিল। মুনি তাহাতে যারপর নাই ব্যস্ত হইয়া, আর তাহার চেয়েও বেশী রাগিয়া, সেই জল সমস্তই খাইয়া ফেলিলেন। খাইবার সময় সকলে অবাক্ হইয়া সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারের তামাসা দেখিয়াছিল, মুনিকে বারণ করিতে সাহস পায় নাই। মুনি সকল জল খাইয়া ফেলিলে পর তাহারা তাঁহাকে অনেক মিনতি করিয়া বলিল, "ঠাকুর! দয়া করিয়া গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিন; ও যে আপনার মেয়ে!"

এ কথায় মুনি অতিশয় তুষ্ট হইয়া কানের ভিতর দিয়া আবার গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিলেন। সেই হইতে গঙ্গার নাম হইয়াছে "জাহ্নবী", অর্থাৎ জহ্নুর মেয়ে।

ইহার পরে আর গঙ্গার কোন বিপদ ঘটে নাই। তিনি ভগীরথের পিছু পিছু পাতালে গিয়া সগরের সেই ষাট হাজার পুত্রের ছাই ভিজাইয়া দিলেন, আর অমনি তাহারা সকলে দেবতার ন্যায় সুন্দর রূপ ধরিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

সেই যে অগস্ত্যমুনি সাগরের জল খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে এত-দিন ধরিয়া সেই সাগর শুকনো পড়িয়াছিল। এতদিন পরে গঙ্গার জল আসিয়া আবার তাহাকে ভরিয়া দিল।

তখন ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত এই সাগরে জল থাকিবে, ততদিন সগরের পুত্রেরা স্বর্গে বাস করিবে। আর এখন হইতে গঙ্গা তোমার কন্যার মত হইলেন, সুতরাং লোকে তাহাকে "ভাগীরথী" বলিয়া ডাকিবে।"

মহাদেবের মাথায় গঙ্গা নামিতেছেন।

U. RAY & SONS.

বল্লে কথা তোমরা কেউ কর্ব্বেনাক বিশ্বাস,
একদিন এক রাক্ষসী টেনেছে যাই নিশ্বাস,
মস্ত দুটো হাতী তার দুটি নাকে ঢুক্‌ল;
নাক হল বন্ধ তার ; নিঃশ্বাস নেওয়া চুক্‌ল।
নাকের ছেঁদার পথে হাতী নাড়ে খালি শুঁড়ই,
বেরোবার নাম নেই, হাঁপিয়ে পড়্‌ল বুড়ী ;
শুঁড় ধরে টানাটানি করে যত রাক্ষসে,
দম্ আট্‌কে বুড়ী গিয়ে গাছ পাহাড়ে নাক ঘষে।
নাকে মারে লাঠির ঘা, নাক ফুলে উঠল ;
কেউবা নাক কাট্‌বে বলে ছুরি নিয়ে জুট্‌ল।
বেগতিক দেখে তখন রাক্ষসী না ছুটে,
বুদ্ধিমান্ এক মানুষের পড়্‌ল পায়ে লুটে।
শপথ করায় বুড়িকে সে, বুদ্ধিমানের ঝানু সে!
কর্ব্বেনাক ক্ষুধায় শান্তি কখ্‌খনো আর মানুষে;
দু'শ মন নস্য তার নাকে গুঁজে হাঁচিয়ে,
বুদ্ধিমান্ দিল তখন রাক্ষসীরে বাঁচিয়ে
ছুট্‌কে পড়্‌ল হাতী দুটো,
দু ক্রোশ দূরের পাহাড়ে ;
সে দিন থেকে রাক্ষসেরা নিরামিষ আহারে
লাগ্‌ল সবে ; বাঁচ্‌ল মানুষ!
দেশের হাড় জুড়াল ;
নটে গাছটি মুড়্‌ল, আর আমার কথা ফুরাল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

২

ছেলেমানুষের বড় কাজ।

একটি ছেলে ছিল, তার নাম ছিল হোমান্ ওয়াল্‌স্ (Homan walsh)। নায়েগেরা নদীর ধারে সে থাক্‌ত। এই নদীর নাম তোমরা সকলেই শুনে থাকবে। দু'শ ফুট উপর থেকে এই নদীর জল ঘর্ঘর শব্দে লাফিয়ে পড়ছে, তার তামাসা দেখ্‌লে অবাক হয়ে যেতে হয়

সেই নায়েগেরা নদীর ধারে হোমান্ থাক্‌ত, আর খুব করে ঘুড়ী উড়াত। লেখা পড়ায় সে কেমন ছিল, সে কথা আমি বল্‌তে পারি না, কিন্তু ঘুড়ী ওড়াত ভারী সরেশ। আশ পাশের কোন গ্রামের কোন ছেলে একাজে তাকে আঁট্‌তে পার্‌ত না।

এর মধ্যে একদিন তার গ্রামের কাছে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার এসে উপস্থিত হল; তারা নায়েগেরা নদীর উপরে ঝোলান পোল তয়ের কর্‌বে। তখন একটি ছোট্ট ষ্টীম্ বোটে ক'রে নদী পার হতে হত, তাতে বড্ড অসুবিধা ছিল। তাই সব ইঞ্জিনিয়ার এসেছে, ঝোলান পোল তয়ের কর্‌তে।

কিন্তু পোল যে ঝোলাবে, আগে একটা শিকল নদীর এপার ওপার করে ফেল্‌তে পারলে তবে ত তার উপর দিয়ে সে কাজটি হবে। সেই শিকল নদী পার ক'রে ফেল্‌বে কি ক'রে? যেখানে পোল তয়ের হবে, সেখানে জলের এমনি তোড় যে তার উপর দিয়ে ষ্টীম্ বোটও যাবার সাধ্য নাই। কেউ বল্ল, সে ত খুব সহজ কাজ! আগে একটা সুতো ফেল্‌বে; তাতে বেঁধে

একগাছি সরু দড়ি নিয়ে যাবে; তাতে বেঁধে কাছি পার কর্‌বে; সেই কাছিতে বেঁধে শিকল নিতে হবে।'

বেশ কথা। কিন্তু আগে সেই সূতো গাছি ফেল্‌বে কি ক'রে? কেউ বল্ল হাউই-য়ের লেজে সূতো বেঁধে দাও। কিন্তু আট শ ফুট জলের উপর দিয়ে সূতো টেনে নিয়ে যেতে পারে, এমন হাউই তখনকার লোকে তয়ের ক'র্‌তে পার্‌ত না, তাই শেষে তারা ঠিক ক'র্‌ল যে ঘুড়ী উড়িয়ে নদীর ওপারে সূতো ফেল্‌তে হবে।

তখন কেউ কেউ বল্ল, 'আরে ঠিক বলেছ। ঐ গ্রামে এক ছেলে থাকে সে ভয়ঙ্কর ঘুড়ী উড়াতে পারে।'

হোমান্ ঘরে বসে আছে, সেইখানে গিয়ে সকলে তাকে খুঁজে বার ক'র্‌ল। তার পিঠ চাপ্‌ড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্ল, 'দেখিত বাপু, তুমি কেমন ঘুড়ী ওড়াতে পার,—ঐ নদীর ও পারে নিয়ে ঘুড়ী ফেল ত' দেখি। তা নইলে ত' আর আমাদের পোলটি করা হ'চ্ছে না।'

হোমান্ তাদের কথায় তখনি তার সকলের চেয়ে বড় ঘুড়ীটি আর সকলের চেয়ে লম্বা আর মজবুত সূতোগাছি নিয়ে প্রস্তুত হল। হাওয়া উল্টো, ওপার থেকে এপারে আস্‌ছে! কাজেই ঘুড়ী উড়াতে হবে ওপারে গিয়ে, নইলে সেটা নদী পার হবে না। পারের ঘাট দু মাইল দূরে। সেইটুকু হেঁটে গিয়ে নদী পার হ'য়ে, আবার সেই দু মাইল হেঁটে এসে তবে ঘুড়ী ওড়াতে হবে।

যা হোক, হোমানের এ কাজটা বড্ড ভাল লেগেছে, একটু হাঁটা হাঁটিতে তার আপত্তি নাই। সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওপারে গিয়ে ঘুড়ী উড়িয়ে দিল। সোঁ সোঁ ক'রে হাওয়া চল্‌ছে, হড়্ হড়্ ক'রে সূতো খুল্‌ছে আর ঘুড়ী দুল্‌তে দুল্‌তে সেই মেঘের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। আশ পাশের লোক আর কেউ সেদিন ঘরে ব'সে নাই, সবাই এসেছে তামাসা দেখ্‌তে। তারা দেখ্‌ছে যে ঘুড়ী একেবারে তাদের মাথার উপরে চলে এসেছে, এখন নামলেই এপারে পড়্‌বে।

কিন্তু হাওয়াও পড়্‌ছে না, ঘুড়ীও নাম্‌ছে না। সারাটা দিন ধরে সেটা সেই মেঘের কাছে কড়্ কড়্ করে উড়্‌তে লাগ্‌ল, সারাটা দিন দেশ শুদ্ধ লোক হাঁ ক'রে তার পানে তাকিয়ে রইল। খালি ভাব্‌ছে, এই এখন পড়্‌বে। তারপর যখন অন্ধকার হ'য়ে গেল, তখনো নদীর দু ধারে বড় বড় আগুন জেলে সকলে সেই ঘুড়ীর তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। হাওয়া পড়্‌তে পড়্‌তে রাত প্রায় ভোর হ'য়ে গেল, তখনো কেউ ঘরে যায় নি।

ভোরের বেলায় হাওয়া পড়ে এল, ঘুড়ীও নাম্‌ল। অম্‌নি হোমান শুন্‌তে পেল যে ওপারের লোকেরা জয়ধ্বনি করছে। তখন তার মনে কি আনন্দই হল! সে বুঝ্‌তে পার্‌ল যে ঘুড়ী ওপারে পড়েছে, তাই ঐ জয়ধ্বনি। তখন এ পারের লোকেরাও জয় জয় শব্দে আকাশ কাঁপিয়ে তুল্‌ল।

হায় রে হায়! এই আনন্দের মধ্যে খ্যাঁচ করে সূতোয় কিসের টান পড়্‌ল আর তখনি পট্‌ ক'রে সেটা ছিঁড়ে গেল। নদীর স্রোতে বরফের চাঁই ভেসে যাচ্ছিল, তাইতে লেগে এই সর্ব্বনাশটি হয়েছে। এত পরিশ্রম এমন ক'রে মাটি হ'ল দেখে হোমান আর চোখের জল রাখ্‌তে পার্‌ল না।

যা হোক, এখন আর দুঃখ ক'রে ফল কি? হোমান্‌ ত' তার কাজ ক'রেছে। বরফে লেগে ছিঁড়ে গেল, সে কার দোষ? আর একদিন এসে আবার ঘুড়ী উড়িয়ে দেখ্‌তে হবে; হয় ত তখন আর কোন দুর্ঘটনা হবে না। এই বলে সকলে তাকে বুঝিয়ে পারের ঘাটে নিয়ে এল। সেখানে এসে দেখা গেল যে, যে বরফে সূতো ছিঁড়ে দিয়েছিল সেই বরফেই পারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ঝড়ো হাওয়ায় উপর থেকে এতই বরফ নেমে এসে খ্যাপার মত নাচ্‌তে লেগেছে যে সেই ছোট্ট বোট-খানি আর তার ভিতর দিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না।

আটদিন এই ভাবে চলে গেল, সেই আটদিন হোমানকে এপারে বসে থাক্‌তে হল। তার পর নদী পার হয়ে ঘরে ফিরেই সে তার ঘুড়িখানি খুঁজ্‌তে গেল। ঝড়ে সেখানার কিচ্ছু হয়নি; আবার ইচ্ছা কর্‌লেই তাকে উড়িয়ে নদী পার করে দেওয়া যেতে পারে। সে কাজটি করতে হোমান আর বেশী দেরী ও করল না। এবারে আর কোন দুর্ঘটনা হয় নি। হাজার হাজার লোকের সাম্‌নে হোমান সেই নদী পার ক'রে সূতো ফেলে দিল, সেই সূতে ধরে নদীর উপর দিয়ে পোল তয়ের হল।

বড় হয়ে হোমান তার গ্রাম থেকে অনেক দূরে গিয়ে বাস করেছিল। সেই খানে ঠিক পোনের বছর হল প্রায় ষাট বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তখন তার দেশের লোকেরা তাকে সেই দূর দেশ থেকে বয়ে এনে নায়েগেরা নদীর ধারে গোর দিয়েছিল। তার ছেলে বেলাকার সেই ঝোলান পোলটি তখন ছিলনা, তার জায়গায় আর একটা খুব মজবুত ইস্পাতের পোল হয়েছিল। সেই পোলের উপর দিয়ে তার দেহ ট্রেণে করে নিয়ে আসা হল।

শিকারী গাছ।

উপযুক্ত রকম জলমাটি বাতাস আর সূর্য্যের আলো পাইলেই গাছেরা বেশ খুসী থাকে, আর তাহাতেই তাহাদের রীতিমত শরীর পুষ্ট হয় আমরা ত বরাবর এই রকমই দেখি এবং শুনি। তাহারা যে আবার পোকা মাকড় খাইতে চায়, শিকার ধরিবার জন্য নানারকম অদ্ভুত ফাঁদ খাটাইয়া রাখে, এবং বাগে পাইলে পাখীটা ইঁদুরটা পর্য্যন্ত হজম করিয়া ফেলে, একথাটা চট্ করিয়া বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর নানা জায়গায় নানাজাতীয় গাছ এই শিকারী বিদ্যা শিখিয়াছে। তাহারা যে সখ কবিয়া পোকা খাওয়া অভ্যাস করিয়াছে তাহা নয়, ঠেলায় পড়িয়াই ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেক শিকারী গাছের বাস এমন স্যাঁৎসেতে জায়গায় এবং সেই সকল জায়গা গাছের পক্ষে এত অস্বাস্থ্যকর, যে সেখানে তাহারা তাহাদের শরীর রক্ষার উপযোগী মাল মসলা ভাল করিয়া যোগাড় করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, দুএকটা পোকা, মাছি বা ফড়িং যদি তাহাবা খাইতে না পারিত, তবে তাহাদের বাঁচিয়া থাকাই মুস্কিল হইত!

আগেই বলিয়াছি, শিকারী গাছ নানা রকমের আছে। ইহাদের শিকার ধরিবার জায়গাও নানারকম। কোন কোন গাছের পাতায় মাছি বা পোকা বসিলে পাতাগুলি আস্তে আস্তে গুটাইয়া যায়। মাছি বেচারা কিছুই জানে না, নিশ্চিন্ত মনে পাতার রস খাইতেছিল, হঠাৎ দেখে চারিদিকে ঘেরা, তাহার মধ্যে সে বন্দী! পাতার গায়ে লোমের মত সরু সরু কাঁটা, তাহারই মুখে আঠার মত রস লাগান থাকে; সেই রসে আট্‌কাইয়া শিকারের পলাইবার আরও অসুবিধা হয়। শুধু তাহাই নহে, পাতা গুটাইয়া গেলে পরে সেই সকল কাঁটার মুখ হইতে একরকম তীব্র হজমি রস বাহির হইতে থাকে; তখন পোকাটা যতই ছট্‌ফট্ করে, ততই আরো বেশী করিয়া রস বাহির হয়। তাহাতেই শিকার মরিয়া শেষে হজম হইয়া যায়! তারপর আপনা হইতেই আবার পাতা খুলিয়া যায়। এবারে যে রঙিন্ ছবি দেওয়া হইল, তাহাতে এই রকম কয়েকটি গাছের ছবি দেওয়া হইয়াছে। ছবিতে দেখ, নীচে জলের মধ্যে একরকম গাছ রহিয়াছে, তাহার সাদা ফুল; তাহার একটু উপরে জলের ধারে একটা খুব রংচঙে গাছ, তাহার পাতাগুলির চেহারা কতকটা কদম ফুল গোছের। তাহারই পাশে ছবির মাঝামাঝি আর একটা গাছ তাহাতে ঠিক যেন মোচার খোলার মত পাতা সাজান। এই সবগুলিই এই প্রকারের শিকারী গাছ এবং ইহাদের শিকার ধরিবার কায়দাও প্রায় একরকম। ছবিতে দেখ একটা মস্ত পোকা ওই কদম ফুলের মত গাছটিতে

উঠিয়াছে। আর একটু পরেই পাছের পাতাগুলি গুটাইয়া মাঝখানে আসিয়া মিলিবে,—একটা ফুটন্ত ফুল মুড়িয়া আবার কুঁড়ি হইয়া গেলে যেমন হয়, সেইরূপ! তখন পোকা বেচারার আর পলাইবার পথ থাকিবে না।

ছবির ডানদিকে নীচের কোণে আর একটা অদ্ভুত গাছ দেখ। এক একটা পাতার আগায় গোলাপী রঙের কি একটা জিনিষ, তার চারিদিকে কাঁটা। এই জিনিসগুলি

fly-trap (মাছি মারা ফাঁদ)। এক একটা ফাঁদ যেন মাঝখানে কব্জা দিয়া আটকান, বইয়ের মত খোলে আবার বন্ধ হয়। কোন পোকা হয়ত পাতায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোন বিপদের চিহ্নও নাই; ঘুরিতে ঘুরিতে সে ওই ফাঁদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। হয়ত দূরে থাকিয়া তাহার ঐ রংটা খুব পছন্দ হইয়াছিল—তাই সে দেখিতে আসিল ব্যাপারখানা কি। কিন্তু সে ত জানেনা যে ফাঁদের গায়ে সরু সুতার মত কি লাগান রহিয়াছে, তাহাতে ছুঁইলেই ফাঁদ বন্ধ হইয়া যায়! সে যমন একটি সুতায় পা অথবা ডানা লাগাইয়াছে অমনি—খট্! ফাঁদ ছুটিয়া একেবারে বেমালুম বন্ধ হইয়া গেল! এখানে আর আঠার দরকার নাই, কারণ ফাঁদটি রীতিমত মজবুৎ এবং খুব চট্‌পট্ কাজ সারে। আর একরকম শিকারী গাছ আছে, তাহাদের শিকার ধরিবার জন্য থলি বা চোঙ্গা থাকে। এই থলি বা চোঙ্গার মধ্যে পোকা বেশ সহজে ঢুকিতে পারে কিন্তু বাহির হওয়া তত সহজ নয়। ইহাদের ভিতরে সরু সরু কাঁটা থাকে—সে গুলির মুখ সব নীচের দিকে, আর তার

গায়ে মোমের মত একরকম কি মাখান থাকে, তাহাতে পোকাগুলি বেশ সহজেই সুড় সুড় করিয়া পিছলাইয়া নামিতে পারে। কিন্তু উপরে উঠিবার সময়ত আর পিছলাইয়া উঠা যায়না—তা'ছাড়া কাঁটার খোঁচাও যথেষ্ট খাইতে হয়! এই সকল থলির তলায় প্রায়ই

জল জমিয়া থাকে, পোকা যখন বার বার পলাইবার চেষ্টা করিয়া হয়রাণ হইয়া পড়ে, তখন সে ওই জলের মধ্যে পড়িয়া মারা যায়। এই সকল গাছে পোকাকে ফাঁকি দিবার এত রকম উপায় থাকে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কোনটার মুখে ঢাক্‌নি থাকে; সে ঢাক্‌নির উপর হইতে চাপ দিলে খুলিয়া যায়! কিন্তু ভিতর হইতে ঠেলিলে খোলে না। প্রায় সবগুলিরই মুখের কাছে খুব সুন্দর রঙিন্ কাজ আর তার চারিদিকে মধু। সেই মধু খাইতে খাইতে পোকা ভিতরের দিকে ঢুকিতে থাকে যত খায় তত মিষ্টি! শেষে এক জায়গায় গিয়া দেখে তাহার পরে আর মধু নাই—তখন সে ফিরিতে চায়! কিন্তু ফিরিতে আর পারে না। কোন কোন থলির ভিতরে খানিকটা জায়গা স্বচ্ছমতন—ঠিক্ যেন সার্‌সি! পোকাগুলি মনে করে এই পলাইবার পথ—আর ক্রমাগত সেই সারসির গায়ে উড়িয়া উড়িয়া হয়রাণ হইয়া পড়ে। কখন কখন এমনও হয় কোন ছোট পাখী বা ইঁদুর হয়ত জল খাইতে আসিয়া, ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং আর বাহির হইতে না পারিয়া প্রাণ হারায়! এই ছবিটাতে দেখ একটা থলির খানিকটা কাটিয়া দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা পাখী মরিয়া রহিয়াছে।

পর্ব্বতের মেয়ে।

পর্ব্বত হইতেই অনেক নদীর জন্ম হয়, তাই তাহারা পর্ব্বতের মেয়ে। ছেলে বেলায় আমাদের কবিতা পুস্তকে পড়িতাম,—

"পর্ব্বত দুহিতা নদী, দয়াবতী তুমি।"

নদীর দ্বারা দেশের কত উপকার হয়, কাজেই তাহারা দয়াবতী বই কি? ভগীরথের গঙ্গা আনার যে গল্প আছে, সেই গঙ্গা ও ভগীরথের প্রতি দয়া করিয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, দেখা যায়। তিনি হিমালয়ের মেয়ে, কেননা, হিমালয় হইতেই তাঁহার জন্ম। পুরাণে আছে যে, হিমালয়ের ঘরেই তাঁহার জন্ম হয়, তারপর তিনি স্বর্গে যান।

স্বর্গের নদী, তাই গঙ্গার এক নাম 'স্বর্ণদী'। সেই স্বর্ণদীকে এখনও আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়; উহার আর এক নাম 'ছায়াপথ'। অবশ্য আমরা জানি, এ নদীর পৃথিবীতে আসার কোন সম্ভাবনাই নাই, কারণ, উহা ত জল নহে, উহা লক্ষ লক্ষ সূর্য্যের ঝাঁক। সে সকল সূর্য্য পৃথিবীতে না আসুক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। আসিলে আমরা পুড়িয়া মরিব।

যাহা হউক, পুরাণের কথা লইয়া আমাদের অত চুল চেরা হিসাব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর, বলিতে গেলে নদীর জল ত আকাশ হইতেই আসিয়াছিল। উহার কতক বৃষ্টি হইতে, কতক বরফ হইতে জন্মিয়াছে। বৃষ্টি আকাশ হইতেই পড়ে, বরফও আকাশের জলের ভাগ জমিয়াই হয়।

গঙ্গা যখন স্বর্গ হইতে পড়িলেন, তখন তিনি শিবের জটার ভিতরে পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। কেহ কেহ বলেন, তিনি পর্ব্বতের ভিতরে আটকাইয়া ছিলেন, ঐরাবত সেই পর্ব্বত দাঁতে কাটাইয়া তাঁহার বাহির হইবার পথ করিয়া দেয়। গঙ্গা যেমন শিবের মাথায় পড়িবার সময় অহঙ্কার করিয়াছিলেন, আর তাহার দরুণ তাঁহাকে নাকাল হইতে হইয়াছিল, ঐরাবতও তেমনি গঙ্গাকে ছাড়াইবার সময় ভারী অহঙ্কার করিয়াছিল, আর তাহার সাজা পাইয়াছিল। গঙ্গার স্রোতে সে ভাসিয়া চলিল, আর কিছুতেই সামলাইতে পারে না। তখন আর উপায় না দেখিয়া 'মা রক্ষা কর!' বলিয়া গঙ্গাকে ডাকিতে লাগিল। তখন গঙ্গা দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

পাহাড়ের গা দিয়া ছোট ছোট ঝরণা বাহির হয়, সেইগুলি একসঙ্গে মিলিয়া নদীর উৎপত্তি। এ সকল ঝরণার জল অনেক সময় উঁচু হইতে লাফাইয়া পড়ে। তখন তাহাদের গর্জ্জন আর আস্ফালনের সীমাই থাকে না, মনে হয় যেন পর্ব্বত

শুদ্ধ ভাসাইয়া নিবে। এইটিই মনে কর যেন গঙ্গার অহঙ্কার। তারপর তাঁহার সাজা যে কিরূপ, তাহার দৃষ্টান্ত কয়েক বৎসর আগে দেখা গিয়াছিল। হরিদ্বার হইতে আরো উপরে একটা জায়গায় পর্ব্বতের গা ধসিয়া নীচে গঙ্গার উপরে পড়িয়া গেল। সেখানকার গঙ্গা উঁচু উঁচু পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সরু পথে কল কল শব্দে বহিতেছে। পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সেই পথ বন্ধ করিয়া দিল, কাজেই গঙ্গা আর বাহির হইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে প্রকাণ্ড হ্রদ হইয়া গেল। উপর হইতে যত জল নামিয়া আসে, সেইখানে সব আটকা পড়ে। সামনে পাহাড় ভাঙ্গার আবর্জ্জনা সাঁকোর মত হইয়া আছে, তাহাকে ডিঙ্গাইতে না পারিলে আর অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। যা হোক, এমনি করিয়া ক্রমাগত জল জমিয়া সেই সাঁকোর উপরে খুবই চাপ দিতে লাগিল, আর সেই চাপে শেষে একদিন সাঁকো ভাঙ্গিয়া গেল। তখন যে কি ভয়ঙ্কর বেগে গঙ্গার সেই রাশীকৃত জল ছুটিয়া বাহির হইয়া ছিল, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। সে জলে ঐরাবতকে ভাসাইয়া নিবে, ইহা ত অতি তুচ্ছ কথা। অনেক স্থানই তাহাতে ডুবিয়া গিয়াছিল।

বোধ হয় জহ্নু মুনির আশ্রমেরও এইরূপ কোন দুর্ঘটনা হইয়া থাকিবে। জহ্নু মুনি বড়ই মজার লোক ছিলেন। অগস্ত্য সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, আর জহ্নু পান করিলেন গঙ্গা। জহ্নু কিন্তু গঙ্গাকে আবার বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, অগস্ত্য তাহা করিতে পারেন নাই। বাহির যে করিয়াছিলেন, তাহাও আবার কাণের ভিতর দিয়া, —পেটের ভিতর হইতে সেখান দিয়া আসিবার কোন পথই নাই। কিন্তু আমরা যদি ভাবি যে জহ্নু মুনি তাঁহার যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য বাঁধ বাঁধিয়া গঙ্গার জল আটকাইয়াছিলেন, তবে এই ঘটনাটি অনেকটা সহজ হইয়া আসে।

তারপর সমুদ্রের কাছে আসিয়া গঙ্গা শতমুখী হইয়াছিলেন। একথা যে সত্য, তাহা মানচিত্রে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালা দেশের সমান জমিতে আসিয়া প্রায় কোন নদীই একপথে ক্রমাগত বহিতে পারে না; তাহার অনেক ডাল পালা বাহির করিতে হয়। গঙ্গার যেমন অনেক মুখ, ব্রহ্মপুত্রেরও তেমনি।

সমান জমিতে নদীর স্রোত কম হয়। তখন জল থিতাইয়া তলায় পলি পড়ে, আর তাহাতে তলা ক্রমে উঁচু হইয়া যায়। এদিকে আবার সমান জায়গায় নদীর তীরও নীচু থাকে। কাজেই জল আর বেশী দিন সেই তীরের ভিতরে আটকা থাকিতে চাহে না। ইহার ফলে প্রায়ই বড় বড় নদীকে এক পথ ছাড়িয়া আর এক পথে চলিয়া যাইতে দেখা যায়।

এই যে গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র, ইহাদের কেহই আর তাহাদের পুরাতন নালা দিয়া বহে না। এখন যে গঙ্গা কলিকাতার নীচ দিয়া বহিতেছে, উহাই আসল 'ভাগীরথী' গঙ্গা; কিন্তু গঙ্গার অধিকাংশ জলই আর এপথে যায় না, সে জল চলে 'পদ্মার' ভিতর দিয়া। এই পদ্মা এককালে খুব ছোট নদী ছিল; গঙ্গার জল ভাগীরথী ছাড়িয়া ইহার ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে পর হঠাৎ বাড়িয়া উঠে। সেই সময়ে ইহার জলে রাজা রাজবল্লভের বিশাল রাজপুরী ভাঙ্গিয়া তাঁহার কীর্ত্তি নাশ করে, তাই ইহার আরেক নাম "কীর্ত্তিনাশা"।

ব্রহ্মপুত্রের জলও এইরূপে এখন তাহার সাবেক পথ ছাড়িয়া 'যমুনার' ভিতর দিয়া চলিতেছে। আসল ব্রহ্মপুত্রের এখন বড়ই দুর্দ্দশা। অনেক স্থলে তাহার সামান্য একটি খণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। লোকে তাহাতে চাস বাস করে, আর লোকে বলে "মরা গাঙ"।

আসল গঙ্গারও অনেক স্থলে এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। গঙ্গা চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া অনেকের মনে খুব কষ্ট হইয়াছিল। তখন তাহারা বাঁধ বাঁধিয়া তাহার জল ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, আর সেই বাঁধান পুকুরটিকেই বলিতে থাকে 'গঙ্গা'। এখনও কোন কোন স্থানে "ঘোষের গঙ্গা" "বোসের গঙ্গা" এরূপ নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

আমি বলিতেছিলাম "পর্ব্বতের মেয়ে"। কিন্তু সকল নদীরই এ নাম হইতে পারে না। এই দেখনা, "ব্রহ্মপুত্র" ত আর মেয়ের নাম হওয়া সম্ভব নহে, আর সে যে কোথায় জন্মাইয়াছে সে কথার একটা আন্দাজি উত্তর মাত্র লোকে দিয়া থাকে।

দুষ্ট সৎমা।

এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর নাম গিয়েছে লোকে ভুলে। রাজার ধন ছিল, হাতী ঘোড়া হাজার হাজার ছিল, কিন্তু একটিও ছেলে ছিল না। সেজন্য তাঁর মনে বড়ই দুঃখ ছিল। তিনি দিন রাত খালি গালে হাত দিয়ে থাকতেন, আর বলতেন, "আহা, যদি আমার একটি ছেলে হত!"

তারপর একদিন রাজার বড় রাণীর একটি মেয়ে হল। রাজা ভাবছিলেন, তাঁর

ছেলে হবে, এর মধ্যে খবর এল, মেয়ে হয়েছে। সে খবর শুনে রাজা রাগে একেবারে জ্বলে উঠ্‌লেন, আর তাতে বড় রাণীর এমন দুঃখ হল যে তিনি দিন দুয়ের ভিতরেই মরে গেলেন।

রাজা বল্লেন, "হায় হায়! একি হল? কেন আমি এমন রাগ কর্‌লুম? হায় হায়! এখন কি হবে?" নাওয়া খাওয়া সব ছেড়ে দিয়ে রাজা মশায় বিছানায় পড়ে কেবল্ এই কথাই বল্‌তে লাগ্‌লেন। কাজেই এর পর তিনিও আর বেশী দিন বাঁচলেন না।

ছোট্ট মেয়েটি হতে না হতেই তার মা গেলেন, বাপ গেলেন; তাকে দেখবার জন্য রইল খালি কতকগুলো সৎমা।

সেই সৎমাগুলো এমনি দুষ্টু ছিল, যে কি বল্‌ব! মেয়েটি একটু বড় হতে না হতেই তারা সকলে যুক্তি করে তাকে একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় নিয়ে ফেলে দিল; সেখানে দলে দলে সিংহ থাকে, মানুষ গেলেই তাকে ধরে খায়। রাজার মেয়ে সেখানে যেতেই একটা সিংহের বাচ্ছা দাঁত খিঁচিয়ে তাকে খেতে এল। রাজার মেয়ে তাতে কিছু ভয় না পেয়ে, সিংহের বাচ্ছাটাকে এক ধমক দিয়ে বল্ল "তুই কে রে?" সিংহের বাচ্ছা খুব গম্ভীর হয়ে বল্ল, "আমার বাবা জানোয়ারের রাজা!" তা শুনে রাজার মেয়ে বল্ল "জানিস্? আমার বাবা ছিলেন মানুষের রাজা!" সেকথায় সিংহের বাচ্ছাটা থতমত খেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল, রাজার মেয়েও তখন আস্তে আস্তে বাড়ী চলে এল।

রাজার মেয়েকে ফিরে আস্‌তে দেখে তার সৎমারা ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেল, আর ভাবল যে এবারে এটাকে পাহাড়ের কাছে গরুড় পাখীদের ওখানে ফেলে দিয়ে আস্‌ব, তা হলে আর ফিরে আস্‌তে পার্‌বে না।

এই বলে তারা মেয়েটিকে নিয়ে সেই পাহাড়ের কাছে ফেলে দিয়ে এল, আর অমনি একটা গরুড় পাখী এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। গরুড় পাখীটা তাকে বাসায় নিয়ে তার ছানাগুলোকে খেতে দিয়ে চলে গিয়েছে, অমনি সে ছানাগুলোকে এক ধমক দিয়ে বল্ল, "তোরা কেরে?" তারা বল্ল, "আমাদের বাবা সব পাখীর রাজা।" তাতে রাজার মেয়ে বল্ল, 'জানিস? আমার বাবা ছিলেন সব মানুষদের রাজা!" তা শুনে গরুড়ের ছানাগুলি ভয়ে জড় সড় হয়ে রইল, রাজার মেয়ে ও সেই ফাঁকে বাড়ী চলে এল।

রাজার মেয়েকে আবার ফিরে আস্‌তে দেখে তার সৎমারা ভারী চটে, তাকে সমুদ্রের মাঝখানে একটা চড়ায় নিয়ে ফেলে দিয়ে এল। সেখান থেকে আর কেমন করে আসবে? কাজেই রাজার মেয়ে ভাব্‌ছে, এবারে মরেই যেতে হবে। এমন

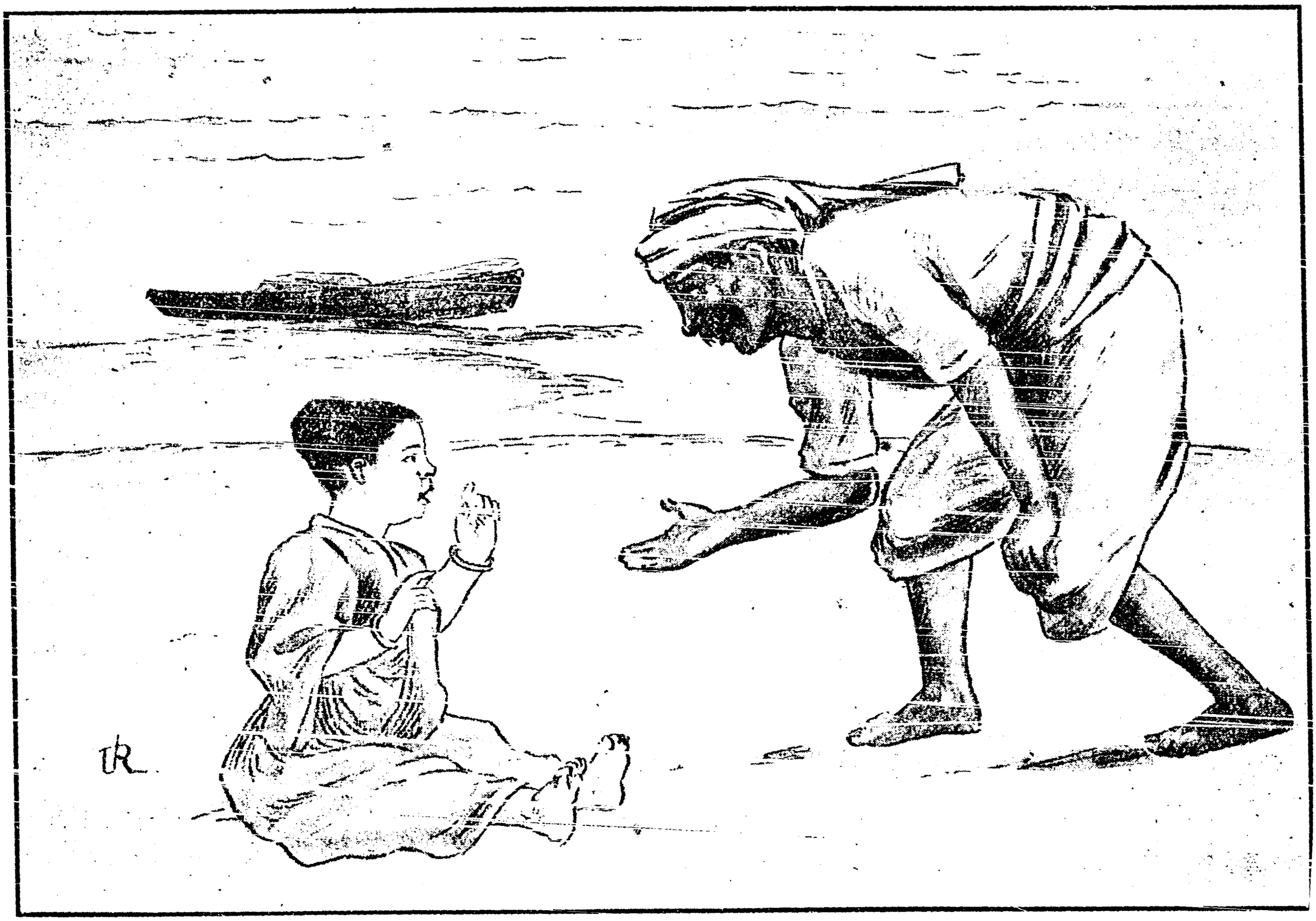

সময় এক জেলে মাছ ধর্‌বার জন্যে ডোঙায় করে সেই চড়ায় এল, আর মেয়েটিকে দেখে বল্ল, "বাঃ, কি সুন্দর একটি মেয়ে পেলাম!" রাজার মেয়ে তখন তাকে বল্ল, "জানিস! আমি অমুক রাজার মেয়ে?" সে কথা শুনে জেলে তখনি তাড়াতাড়ি নিয়ে তাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে এল।

তখন সৎমারা বল্ল, "কি আপদ! এটা যে তবু মরেনি!" এই বলে তারা জল্লাদকে ডেকে হুকুম দিল, "এটাকে নিয়ে মাটিতে পুতে রেখে আয়!"

জল্লাদ কি করে? তাকে হুকুম দিয়েছে, কাজেই রাজার মেয়েকে সে ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু সে ভাল লোক ছিল, তাই সে মেয়েটিকে পুতবার সময় এমনি করে মাটি দিল, যেন তার নাকে হাওয়া যাবার একটু পথ থাকে। তারপর সেই রাত্রে ভূমিকম্প হয়ে সব মাটি উল্টে গেল, আর রাজার মেয়েও ভিতর থেকে উঠে ঘরে চলে এল।

তা দেখে সেই দুষ্ট সৎমারা করল কি, একটা তুঁত গাছের ভিতরে গর্ত্ত খুঁড়ে, মেয়েটিকে তাতে পুরে, তাকে শুদ্ধ গাছটা সমুদ্রে ফেলে দিল। সেই গাছ ভাস্‌তে ভাস্‌তে গিয়ে জাপান দেশের কূলে ঠেকেছিল, কিন্তু হায়, এত কষ্ট সয়ে মেয়েটি বেঁচে থাক্‌তে পার্‌ল না।

তখন দেবতারা সেই মেয়েটিকে দয়া করে একটি রেশমের পোকা করে দিলেন। তাই থেকে এখন লোকে রেশমী পোষাক পর্‌তে পায়। আজ ও রেশমের পোকারা তুঁতের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে।

সাপের খাওয়া।

আমার একবার তিনটা বড়ি এক সঙ্গে জল দিয়া গিলিতে হইয়াছিল, তখন আমার মনে হইয়াছিল যে এমন কঠিন কাজ ও করিতে হয়? সেকথা যদি কোন একটা সাপে শুনিত, তবে সে আর কিছুতেই হাসি থামাইয়া রাখিতে পারিত না।

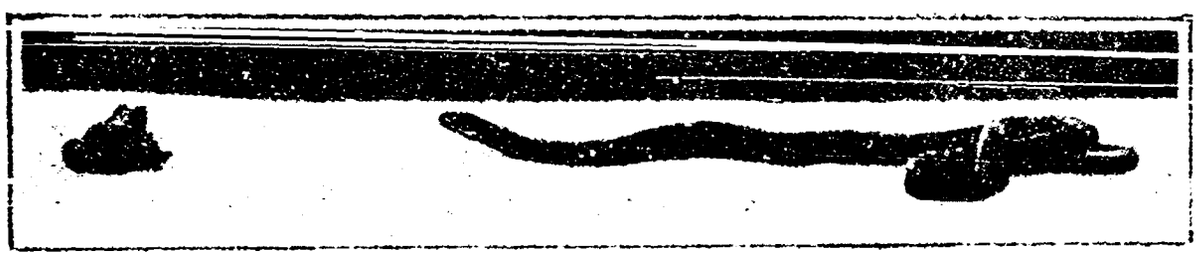

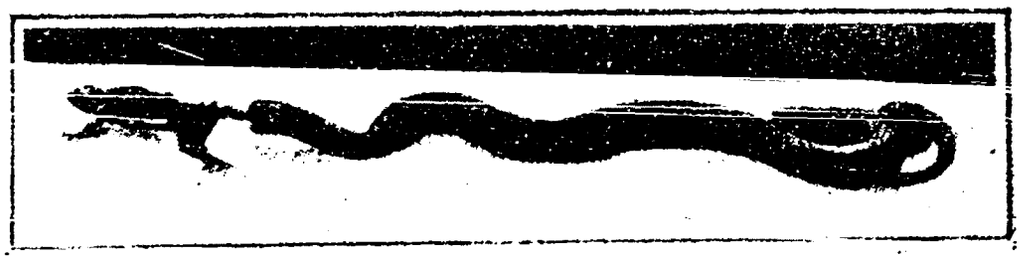

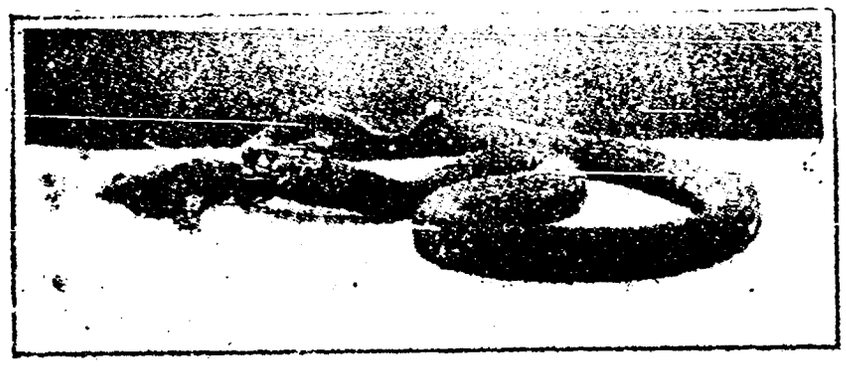

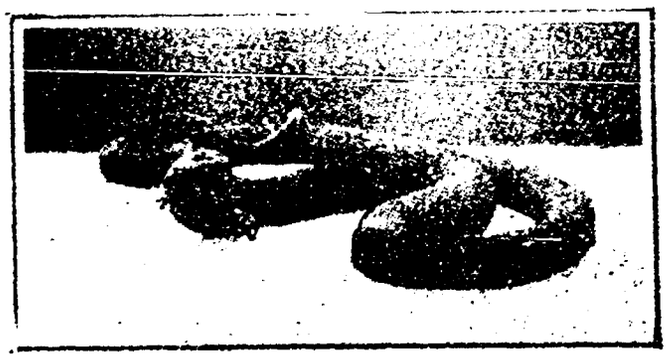

সাপেরা মস্ত মস্ত জিনিষ গিলিয়া খায়। খাবার জিনিষটা তাহার নিজের চেয়ে ঢের মোটা হইলেও সে সহজে তাহাকে ছাড়েনা, অন্ততঃ একবার গিল্লিতে চেষ্টা করে।

ছবিতে দেখ,. সাপটা তাহার চেয়ে কত খানি মোটা একটা ব্যাঙ্‌কে গিলিতে যাইতেছে। ব্যাঙ্‌টাও কি বোকা! কোথায় লাফাইয়া পলাইবে, তাহার বদলে সে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে। সাপটা আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া থপ্‌ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলে পর বেচারার টানাটানি দেখ। কিন্তু এখন আর টানাটানি করিয়া ফল কি? সাপে যখন একবার ধরিয়াছে, তখন আর ছাড়িবে না; তাহার সাক্ষী শেষে তিন খানা ছবি।

চতুর্থ ছবি খানিকে একটু ভাল করিয়া দেখিবে। সাপটার হাঁ টা কতখানি বড় হইয়াছে! তুমি আমি হাজার চেষ্টা করিলে এত বড় হাঁ করিতে পারিব না। আমাদের চোয়ালের হাড় কাণের কাছে কব্‌জা আটকান। এ অবস্থায় যত বড় হাঁ করা সম্ভব, আমরা তত বড় হাঁই করিতে পারি। কিন্তু সাপের চোয়াল আলগা, তাহার কোন জায়গা কিছুতে আটকান নাই; কাজেই, দরকার হইলে সে আমাদের চেয়ে অনেক বড় অর্থাৎ তাহার গালের চামড়া যত লম্বা হয়, তত বড় হাঁ করিতে পারে।

দুঃখের বিষয়, এই ছবি গুলিতে এই ঘটনার শেষ দেখান হয় নাই। ব্যাঙটাকে গিলিয়া শেষ করিলে পর সাপের কেমন চেহারা হয়, সেটা দেখিবার জিনিষ। সেরূপ চেহারার একটা ছবি দেওয়া গেল। এ ছবির কথা বোধ হয় আমার আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই। খুব খাইলে পেট ভারী হয়, একথা আমরা সকলেই মাঝে মাঝে বলি; কিন্তু যথার্থ পেট ভারী যে কাহাকে বলে, এইরূপ একখানা ছবি দেখিলে তবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ উদরটি লইয়া যে ছুটাছুটি করিতে একটু অসুবিধা হইবে, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। এমন অবস্থায় সাপকে পাইলে তাহাকে ঠেঙ্গাইয়া মারা খুবই সহজ।

ছবির সাপটি একটি বোরা সাপ, তাহার পেটের ভিতরে একটি ছাব্বিশ সের ওজনের ছাগল। সাত দিন আগে এই সাপটি সাড়ে দশ সের ওজনের একটি ছাগল আর একুশ সের ওজনের একটি হরিণ ছানা দিয়া জলযোগ করিয়াছিলেন। ইহার চেয়েও বড় জন্তুকে গিলিতে পারে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এই ছাব্বিশ সের ওজনের ছাগলটা তাহাকে দেওয়া হয়। কেহই মনে করে নাই যে এটাকে সে গিলিতে পারিবে, কিন্তু সে ফটোওয়ালা আসিবার আগেই সে কাজ শেষ করিয়া ফেলিল। যাহা হউক, ইহাতে তাহার খুব পরিশ্রম হইয়াছিল, আর সে অনেক বার গোঙাইয়া ছিল।

কোন জন্তুকে গিলিবার আগে বোরা সাপ সেটাকে জড়াইয়া ধরে। সে জড়ান

এমনি বিষম জড়ান যে তাহার চাপেই জন্তুটা থেৎলা হইয়া যায়। তার পর সাপটা সেটাকে গিলিতে থাকে। একটা বোরা সাপ এমনি করিয়া দেড় ঘণ্টার মধ্যে একমণ ছয় সের ওজনের একটা ছাগলকে গিলিয়া ফেলিয়াছিল।

একবার একটা জন্তুকে গিলিতে আরম্ভ করিলে নাকি সাপের আর থামিবার শক্তি থাকে না, জন্তুটাকে গিলিয়া শেষ করিতেই হয়।

সাপের ছাগল গেলার সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। কাফ্রীরা একটা দেওয়ালে ছিদ্র করিয়া তাহার দুপাশে দুটা ছাগল বাঁধিয়া রাখিল। বোরা সাপ আসিয়া দেখিল ফলার প্রস্তুত এখন পাতে বসিলেই হয়! সে আগে একটি ছাগলকে গিলিল, তারপর দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া গলা বাড়াইয়া আর একটিকেও খাইল। তাহাতে মজা হইল এই যে, দেওালের দুপাশে দুই ছাগল সাপের গায় দুই প্রকাণ্ড পুঁটুলীর মত হইয়া আছে, সে পুঁটুলী আর দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া গলিতে চাহে না, কাজেই সাপ মহাশয় ছাগুলে গেরোয় বাঁধা পড়িলেন। এমনটি যে হইবে, তাহা জানিয়াই কাফ্রীরা দুটা ছাগল খরচ করিয়াছিল, আর আগে থাকিতেই সাপ মহাশয়ের জন্য বড় বড় মুগুরের যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। তার পরে যেই তাহারা দেখিল যে তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে, এখন আঁচাইবার সময়, অমনি—বুঝিতেই পার!

একটা খাঁচার ভিতবে একটা প্রকাণ্ড বাঘ ছিল, আর সেই খাঁচার পাশে একটা বোরা সাপ ছিল। ইহার মধ্যে কেমন করিয়া সাপটা আসিয়া বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়াছে। বাঘ বোধ হয় ইহার পূর্ব্বে আর এমন অদ্ভুত জন্তু দেখে নাই, তাই সে ভারী আশ্চর্য্য হইয়া তাহার তামাসা দেখিতে লাগিল; সে মনে করে নাই যে উহার পেটে কোন দুরভিসন্ধি আছে। এমন সময় সাপটা হঠাৎ তাহাকে জড়াইয়া ফেলিল। বাঘের ত তখন বিপদের আর সীমাই নাই। গলায় বুকে আর সামনের দুপায়ে বাঁধন পড়িয়াছে, দুখানি পাঁজর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যুদ্ধ করিবার বড় বড় হাতিয়ারগুলি সবই আটকা, বেচারা এখন কি দিয়া প্রাণ বাঁচায়? যাহা হউক, তাহার পিছনের পা দুখানি খোলা ছিল; তাই দিয়া সে প্রাণপণে সাপের গায় আঁচড়াইতে লাগিল। হাজার হউক, বাঘের আঁচড়। সে আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দেখিতে দেখিতে সাপ মরিয়া গেল।

বোরা সাপ যেমন বাঘের হাতে জব্দ হইয়াছিল, ছোট ছোট সাপ (বিশেষতঃ ঢোঁড়া সাপ) অনেক সময়—তেম্‌নি কই মাছের কাছে জব্দ হয়। কই মাছের কাঁটা বড়ই ভয়ঙ্কর! তাহাকে গিলিতে গেলে সেই কাঁটা গলায় আটকাইয়া যায়। তখন আর সাপের

বাছা গিলিতেও পারেন না, ফেলিতেও পারেন না ; কেবল ওয়াক্ তোলাই সার হয়, আর সেই অবস্থায়ই তাঁর প্রাণটি বাহির হইয়া যায়।

তৌং য়ৌং।

একটি ভারী গরীব ছেলে ছিল, তার নাম ছিল তৌং য়ৌং। বেচারা এত গরীব যে, ভাল করে খেতেই পায় না ; তার উপর আবার তার মা মরে গেল।

মা মরে গিয়েছে, এখন তাকে গোর দিতে হবে, তাতে পয়সা লাগ্‌বে। তৌং য়ৌং যা কিছু ছিল সব বেচে সেই পয়সার যোগাড় করে, মাকে গোর দিল।

এখন আর বেচারার হাতে একটি পয়সাও নাই, বেচবার মতন ও কিচ্ছু নাই। এমন সময় আবার তার বাবা ও গেল মরে। এখন উপায় কি হবে ? বাবাকে কি করে গোর দিবে ? আর তার বাবার গোর হবেনা, সেও কি হতে পারে ? অনেক ভেবে শেষে সে এক তাঁতির কাছে গিয়ে নিজেকে বেচে এল। তখন আর তার বাবাকে গোর দিবার জন্য টাকার ভাবনা রইল না।

গোর দেওয়া বেশ ভাল মতেই হয়ে গেল। তার পর তৌং য়ৌং সেই তাঁতির কাছে চলেছে, এমন সময় যার পর নাই সুন্দর একটি মেয়ে কোথেকে এসে তাকে বল্ল, "আমি তোমার সঙ্গে যাব!" তৌং য়ৌং তাতে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "আমার সঙ্গে কোথায় যাবে ? আমি যে এক তাঁতির কাছে

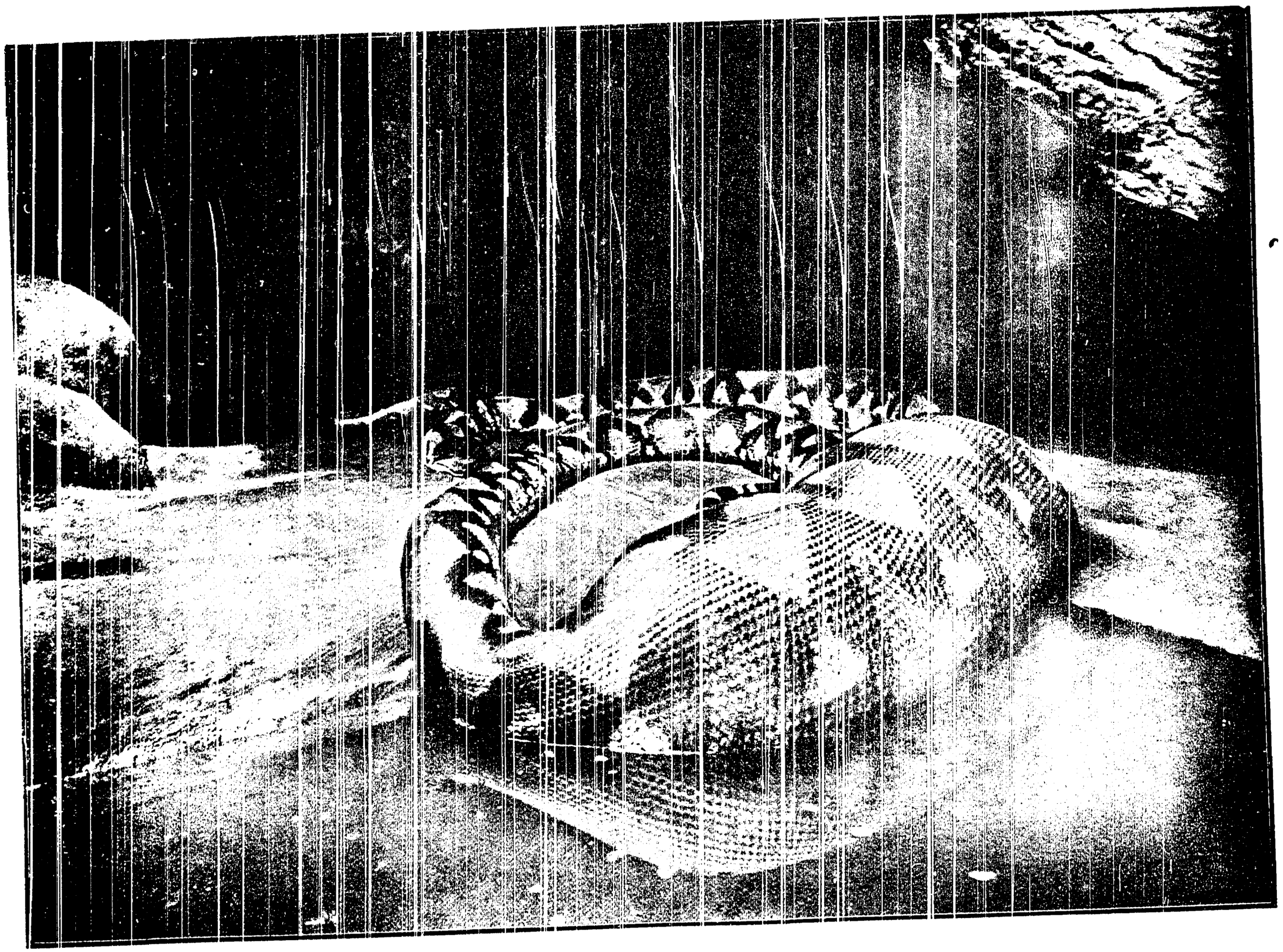

অজগরের জলযোগ

(একটা আস্ত ছাগল গিলিবার পর)

নিজেকে বেচে ফেলেছি, আর তার কাজ কর্‌তে যাচ্ছি।" মেয়েটি বল্ল, "তাই হোক, আমিও তোমার সঙ্গে যাব, আর সেই তাঁতির কাপড় বুনে দিব।"

তখন থেকে সেই মেয়েটি সেই তাঁতির কাপড় বুনে দেয়। এক মাসের ভিতর সে একশ খানা কাপড় বুনে ফেল্ল। সে কাপড় এমনি সুন্দর, আর তাতে এমনি চমৎকার ফুল কাটা যে, তেমন আর কেউ কখনো দেখেনি। তাঁতি তাতে খুসী হয়ে সেই মেয়েটিকে ঢের টাকা দিল। মেয়েটি সেই টাকা দিয়ে তৌং য়ৌং কে তার চাকরী থেকে ছাড়িয়ে আন্‌ল।

তৌং য়ৌং তখন ভারী খুসী হয়ে সেই মেয়েটির সঙ্গে ঘরে ফিরে চলেছে আর ভাব্‌ছে, আমরা দুজনে মনের সুখে ঘর কন্না কর্‌ব। যেতে যেতে তারা সেইখানে এসে উপস্থিত হল, যেখানে সেই প্রথমে তাদের দেখা হয়। তখন মেয়েটি বল্ল, "তৌং য়ৌং, এখন তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি আমার দেশে যাই।"

তৌং য়ৌং বল্ল, "সেকি? তোমার দেশ আবার কোথায়? তুমি আমার ঘরে যাবে না?"

মেয়েটি বল্ল, "না তৌং য়ৌং, আমি তোমার ঘরে যাব না। আমার দেশ স্বর্গে, সেই খানে এখন আমি যাব।"

এ কথা শুনে তৌং য়ৌংএর বড় দুঃখ হল, সে বল্ল, "তুমি যদি আমার সঙ্গে না যাবে, তবে আমার জন্য কেন এত কর্‌লে! কেন এমন করে খেটে তার টাকা দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আন্‌লে?"

মেয়েটি বল্ল, "তুমি তোমার মা বাপকে ভক্তি করেছিলে, তাই দেবতারা খুসী হয়ে তোমাকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এখনত সে কাজ হয়ে গেল, এখন তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি আমার দেশে যাই।"

এই বলে মেয়েটি আকাশে উঠে তার দেশে চলে গেল। তখন তৌং য়ৌং ভাব্‌ল, "তবে আমি আর ঘরে গিয়ে কি কর্‌ব? আবার আমার সেই মুনিবের কাছে ফিবে যাই।"

সে তাই কর্‌ল, আর এবারে তাঁতির কাছে ফিরে গিয়ে সেই মেয়েটির মতন করে কাপড় বুন্‌তে লাগ্‌ল। সে কাপড় যে দেখে. তার আর কোন কাপড়ই পছন্দ হয় না। কাজেই তৌং য়ৌংএর কাপড় খুব বিক্রী হতে লাগ্‌ল, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার ঢের টাকা হয়ে গেল।

তার পর ত খুব সুখের কথাই হল।

বিনোদের বীরত্ব।

মাঘের দিবস শেষ,
পরিয়া খেলার বেশ,
গৃহে ফিরে যায় ছাত্রগণ ;
কেন জয়ী কোন্ পক্ষ
লম্ফে ঝম্পে কেবা দক্ষ
পরস্পর এই আলোচন।
দু' একটী তারা ওঠে,
দু' একটী দীপ ফোটে,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে দেবালয়ে ;

ব'সি বট তরু শাখে
পেচক সদলে ডাকে
সন্ধ্যা হেরি প্রফুল্ল হৃদয়ে।
খালে, বিলে মাছ ধ'রে
জেলেরা ফিরিছে ঘরে,
গোষ্ঠ হতে ফিরিছে রাখাল ;
কুল বধূ জল লয়ে
গৃহে যান ব্যগ্র হয়ে,
হেলে দুলে চলে ধেনু পাল।

ঘিরে আসে অন্ধকার,
ক্রমে পথ দেখা ভার,
মিলে ধূম কুয়াশার সনে ;

শীতল উত্তর বায়
কম্পান্বিত করে কায়,
ব্যগ্র লোক ফিরিতে ভবনে।

পথ পাশে পচা বিল,
পোকা করে কিল বিল,
বারি যেন তুষার শীতল ;
ঘোষদের ছোট মিনি
সেই পথে একাকিনী,
চলিয়াছে কাঁখে লয়ে জল।
লাল রঙা চেলি খানি
মাথায় দিয়াছে টানি
মুখ আধ ঢাকা ঘোমটায় ;
চলিয়াছে ভয়ে ভয়ে,
হেরি তারে ক্রুদ্ধ হয়ে
ধেনু এক পশ্চাতেতে ধায়।
না আসিতে ছাত্রগণ
শৃঙ্গ করি আস্ফালন
ফেলে তারে আঘাতিয়া বলে।
সবে বলে "হায় হায় !"
কিন্তু না নামিতে চায়
শীত ভয়ে কেহ পচা জলে।
বিনোদ আছিল পাছে,
ছুটিয়া আসিল কাছে,
দৃষ্টিমাত্র পড়ে লম্ফ দিয়া ;
ডুব দিয়া পড়ি জলে
টানিয়া তুলিল বলে
উঠে তীরে কোলেতে লইয়া।
কাঁপে মিনি থর থর,
শীতে জড় কলেবর,
ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাস বয় ;
হেরি তার হাত ধরে
পঁহুছিয়া দিলে ঘরে
বিনোদেরে "ধন্য" সবে কয়।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু।

বনের খবর।

আমরা আটদিনের খোরাক নিয়ে লঙ্গাই নদীর পানে চলেছি। সেইখানে লুশাই পাহাড় থেকে আমাদের জন্য লোক আসবে, রসদও সঙ্গে আসবে, সে সব লোক সেখানে এসেছে কি না, দেখবার জন্য আমি লঙ্গাই নদীতে একজন লোক পাঠিয়ে দিলাম। পরের দিন সঙ্গের সকলকে নিয়ে নিজেও গিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'লাম। গিয়ে দেখি, লুশাই পাহাড়ের লোকদের কোন খবরই নাই। দেখেই ত আমার চক্ষুস্থির ! আমাদের চা'ল ফুরিয়ে এসেছে ; ১৫।২০জন লোক সঙ্গে ; এরা খাবে কি ?

খালাসীদের যার কাছে যে চা'ল ছিল, তাড়াতাড়ি তার সব এনে আমার নিজের কাছে রেখে দিলাম। রোজ সকালে জন পিছু ৩।৩½ ছটাক করে চাল মেপে দি, তাই রেঁধে তারা ফ্যাণ শুদ্ধ খায়। তিন চার জন লোককে টাকা দিয়ে তখনি মহারাজের রাজ্যে থেকে চা'ল আনতে পাঠালাম।

আর দুজনকে পাঠালাম নদীর ধারে ধারে নীচের দিকে নেমে গিয়ে সেই লুশাই পাহাড়ের লোক-গুলোর খবর নিতে। বাকি সকলে সেখানেই রইলাম।

বেচারা খালাসীদের বড়ই কষ্ট! রোজ একসের চা'ল খেয়ে যাদের অভ্যাস, সাড়ে তিন ছটাকে তাদের কি হবে? ক্ষুধায় বেচারাদের প্রাণ যায় আর কি। বন্দুক নিয়ে রোজ বনে বনে ঘুরি, কিন্তু শীকার মিলে না। খালাসীরা এসে মিনতি করে বলতে লাগল, "যে চা'ল আছে, আমাদের দিন্। আমরা একটিবার পেট ভরে খাই, তার পর কপালে যা থাকে হবে।" আমি অনেক বুঝিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিলাম।

এমনি করে ৩ দিন গেল, ৪ দিনের দিন আমাদের সেই তিনটী লোক মহারাজের রাজ্য থেকে চাল নিয়ে এল। খালাসীদের তখন খুবই আনন্দ। সেদিন তারা এমনি পেট ভরে খেয়েছিল যে, আর কাজ করবার সাধ্য ছিলনা। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় আমাদের আর দুজন লোকও আমাদের ডা'ল চা'ল শুদ্ধ সেই লুশাই পাহাড়ের লোকদের নিয়ে ফিরে এল।

লুশাই পাহাড়ের যে থানটায় আমাদের কাজ ছিল, সে বড় ভয়ানক স্থান। ৬৫০।৭০০ বর্গমাইল জায়গা, তার মধ্যে পথও নাই, গ্রামও নাই। সঙ্গে প্রায় ৬০ জন লোক, খাবার জিনিসও ঢের; তাই বইতে দুটো হাতী এসেছে। ১২।১৪ জন লুশাই বন কেটে পথ করে আগে আগে চলে, তবে আর সকলে যেতে পারে। এত করে সমস্ত দিনের মেহেনতের পর ৩, ৪ কি ৫ মাইলের বেশী পথ এগোয় না। সন্ধ্যাবেলায় যখন তাঁবু পড়ে, তখন যেন কারুর হাত পা চলতে চায় না, তাই নিয়ে আবার রাত্রে পাহারা দিতে হয়। সে ঘোর বনে মানুষের গন্ধও নাই, খালি জানোয়ারের কিলি-বিলি! সন্ধ্যার পর পা ফেলতে গেলেই মনে হয় বুঝি বাঘই না কি মাড়াচ্ছি। ৯।১০ টার আগে সূর্য্য দেখা যায় না। এক এক জায়গায় এমনি বন যে, আকাশ দেখবার যো নাই; ঠিক মনে হয় যেন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমি সকলের আগে আগে যাই; সঙ্গে একজন বুড়ো লুশাই থাকে, সে মস্ত শিকারী। দুজন খালাসীও সঙ্গে থাকে, তাদের মধ্যে শ্যামলালের হাতে আমার দূরবীণ আর টোটার থলে, আর এক জনের হাতে আমার খাবার আর জল। ওদের তিন জনের হাতেই এক একখানি দা।

আমরা চারজনে গাছে গাছে দেগে কেটে সকলের ½।৪ মাইল আগে আগে যাই, সেই দাগ দেখে দেখে লুশাইরা বন কেটে আসে। রোজ এমনি হয়। একদিন ১৫।২০ ফুট চওড়া একটা হাতীর রাস্তা পাওয়া গেছে। আজ লোকদের খুব মজা, বন কাটতে হচ্চেনা।

যেতে যেতে দেখি পথের উপরে একটা প্রকাণ্ড গাছ পড়ে আছে। শুধু গাছটাই আমার বুকের সমান উঁচু তার উপর ডাল পালা। ভাবছি আমাদের হাতীগুলি এর উপর দিয়ে যাবে কি করে? ভাবতে ভাবতে গাছটার উপর চড়তে আরম্ভ করেছি, আর অমনি আমার পায়ের নীচে একটা কি যেন হুড়্মুড়্ করে উঠল। আমি বল্লাম, "ক্যা হ্যায়রে?" শ্যামলাল বল্ল, "হল্লুমান হোগা, হুজুর।" বলতে বলতেই সেটা গাছ পালা ভেঙ্গে কামানের গোলার মতন বেরিয়ে এসেছে—গণ্ডার এক নজর

আমাদের দিকে তাকিয়েই "ঘোঁৎ!" বলে ছুট দিল। আমি পিছনের দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছি, শ্যামলাল বন্দুক দিবে; কিন্তু শ্যামলাল কোথায়? সে ততক্ষণে প্রাণ বাঁচাবার সোজা পথ খুঁজছে। লাফিয়ে নেমে, তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে, টোটা ভরে গণ্ডার মারতে ছুটলাম, কিন্তু সেটা সেই অবসরে কোথায় যে গা ঢাকা দিয়েছে, আর তাকে দেখতে পেলাম না।

পরদিন খুব ভোরে উঠে চলতে আরম্ভ করেছি। আজকের পথ নালায় নালায়, সঙ্গে সঙ্গে সেই বুড়া লুশাই আর শ্যামলাল। ভোরের বেলায় নানারকম শীকার মিলে, তাই বন্দুক ভরে নিয়ে চলেছি। শীকার সামনে পড়ছে, কিন্তু মারতে পারছিনা। একে ঘোর বন, তাতে কোয়াসা, শীকার দেখতে না দেখতে মিলিয়ে যায়। হাতী, গণ্ডার, বাঘ, হরিণ, সকল রকম জানোয়ারেরই তাজা পাঞ্জা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পাখীর অভাব নাই, তার গোটা দুই মেরেছিও। হাতীর পথ ধরে নালা এপার ওপার করতে করতে পাকোয়া নদীর দিকে যাচ্ছি, সেইখানে গিয়ে রাত্রে থাকতে হবে। একবার নালায় নেমেছি, লুশাইটি আমার আগে, আমি পিছনে। নালা পার হয়ে উপরে উঠতে

যাব এমন সময় আমাদের একটু সামনেই ভারী একটা জল কাদা তোলপাড়ের শব্দ হল। নিশ্চয় বোঝা গেল যে, হাতী, গণ্ডার বা বুনো মোষ, এর কেউ হবে; কাদায় লুটিয়ে, আয়েস করছিল,

আমাদের গন্ধ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! আমরা তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যস্ত হয়ে দুই লাফে ডাঙ্গায় ফিরে এসে চেয়ে দেখলাম, ব্যাপার খানা কি! ব্যাপার একটি বিশাল গণ্ডার, যমদূতের দাদা মশায়ের মতন দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। লাল দুটি চোখ মিট মিট করছে, কাণ দুটি পিছনে হেলান।

আমার পকেটে তিনটি মাত্র গুলিওয়ালা টোটা; মাঝখানে ফুট পোনের চওড়া নালা,—ওপারে গণ্ডার, শ্যামলাল পালিয়েছে! লুশাইটি খালি বলছে "মারো সাহেব!" তার মুখে দা খানা, পা একটা গাছের গোড়ায়, হাত ডালের উপরে, বেগতিক দেখলে বানরের মত উঠে যাবে। আমি কি করব? সেই ছেলেবেলা গাছে চড়তাম, এখন সে বিদ্যা একেবারেই ভুলে গেছি, তার উপর আবার বুট পায়। কাজেই আস্তে আস্তে বন্দুকে গুলি ভরে তয়ের রইলাম। গণ্ডার যদি এপারে আসতে চায়, তবেই মারব, নইলে নয়। লুশাই খালি বলছে "মারো, মারো!" আমি কেন সে কথায় কাণ দিতে যাব? তিনটিমাত্র গুলি নিয়ে গণ্ডার মারতে গিয়ে প্রাণটি হারাব, এমন বোকা আমি নই।

যা হোক আমারও গুলি মারতে হলনা, লুশাইরও গাছে উঠতে হলনা। গণ্ডারটা মিনিট খানেক পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর একটা হুঙ্কার দিয়ে ছুটে গিয়ে পাহাড়ে উঠল। তার সামনে যত বাঁশ পড়েছিল, সব পাকাটির মত পট্ পট্ করে ভেঙ্গে গেল।

তখন আমরা ধীরে ধীরে আবার চলতে লাগলাম। আধ মাইল ও যাইনি অমনি আবার সামনে বিষম হুড়হুড়ি! তারপর মড়্ মড়্ করে বাঁশ ভাঙ্গার শব্দ; তারপর উঃ! কি ভীষণ গর্জ্জন! সারাটি বন থর থর করে কেঁপে উঠল। এবারে লুশাইর আশে পাশে গাছ নাই, কিসে উঠবে? একটু বেকায়দা, শ্যামলাল এর আগেই এসে জুটেছিল, তার কাছে থেকে ৮।১০টা গুলিওয়ালা টোটা চেয়ে নিয়ে আমি পকেটে পুরেছিলাম।

এবারে আমি পথ ছেড়ে একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁতওয়ালা হাতীর গর্জ্জন! সেটা হয় থ্যাপা ("মস্ত"), না হয় অন্য কোন জানোয়ার দেখেছে। লুশাই বল্ল, "বোধ হয় সেই গাণ্ডারটা ওর সামনে পড়েছে।"

হাতীটা কিন্তু আমাদের দিকে আর এল না। সে তিন চারটা ডাক দিয়ে আস্তে আস্তে বাঁশ ভাঙতে ভাঙতে পাহাড়ে উঠে গেল। আমরাও আবার চলতে লাগলাম।